জাতিগঠনে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার

জাতিগঠনে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার

প্রবাসী কার্য্যালয়,
১২০।২, আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা

মূল্য একটাকা

প্রবাসী প্রেস
১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পরম ভক্তিভাজন বিশ্বকবি
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের
চরণকমলে শ্রদ্ধাঞ্জলি

হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে
জাগ রে ধীরে—
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে।

হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে
নমি নর-দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দন করি তারে।

ধ্যান-গম্ভীর এই যে ভূধর,
নদী জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হের পবিত্র
ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে॥

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হ'তে
সমুদ্রে হ'লো হারা।

হেথায় আর্য্য হেথা অনার্য্য
হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক হূণ-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হ'লো লীন।

পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে॥

রণধারা বাহি জয়গান গাহি'
উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরি পর্ব্বত
যারা এসেছিল সবে,
তা'রা মোর মাঝে সবাই বিরাজে
কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তা'র বিচিত্র সুর।

হে রুদ্র বীণা, বাজো, বাজো, বাজো,
ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজো,
বন্ধ নাশিবে, তা'রাও আসিবে
দাঁড়াবে ঘিরে,—
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে॥

হেথা একদিন বিরাম বিহীন
মহা ওঙ্কার ধ্বনি,
হৃদয়-তন্ত্রে একের মন্ত্রে
উঠেছিল রণরণি।
তপস্যাবলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া।

সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে
আনত শিরে,—
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে।

সেই হোমানলে হের আজি জ্বলে
দুঃখের রক্ত শিখা,
হবে না সহিতে মর্ম্মে দহিতে
আছে সে ভাগ্যে লিখা।
এ দুখ বহন করো মোর মন,
শোনো রে একের ডাক।
যত লাজ ভয় করো করো জয়
অপমান দূরে যাক্।
দুঃসহ ব্যথা হ'য়ে অবসান
জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ!
পোহায় রজনী জাগিছে জননী
বিপুল নীড়ে
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে।

এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক্ অপনীত
সব অপমান-ভার।
মা'র অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র করা
তীর্থনীরে।
আজি ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে॥

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মালী দেয় জল কুসুম-কাননে সেবা করে অকাতর,
অলি গাহে গান পিয়ে ফুল-মধু করে কত সমাদর !
ফুল বোঝে তাই মালীর কদর, মধুকর চাহে মধু,
রূপে রসে বাসে চাহে মজিবারে মরমী পথিক বঁধু।

শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার

ভূমিকা

বাহিরের খ্যাতি, বহির্জগতের আদর-অভ্যর্থনা রবীন্দ্রনাথের জীবনে যতটা এসেছে তেমন খুব কম ভারতবাসীর জীবনেই দেখা যায়। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর থেকে গত কুড়ি বছর ধরে তাই দেখি আমাদের দেশের মধ্যে একটা ধারণা জন্মেছে যে, রবীন্দ্রনাথের মন দেশের চেয়ে যেন বিদেশ ও বিদেশীর প্রতিই বেশী উন্মুখ! অর্দ্ধশতাব্দীর একনিষ্ঠ স্বদেশসেবা ও সাধনার পর দেশবাসীর কাছে এই রকম উপহার নিষ্ঠুর পরিহাসের মতই লাগে। কিন্তু এই রকম বিকৃত ধারণা যে, মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। সপ্ততিতম জন্মোৎসবে সমগ্র দেশের নরনারী জাতি-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে কবিকে যে গভীর ও একান্ত প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেছে সেটি তাঁর কবি ও কর্ম্মী-জীবনের একটি অনন্যপূর্ব্ব ঘটনা। তেমনি সত্য প্রত্যুত্তর উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে ও দেশমাতৃকাকে কবির 'শেষ প্রণাম'। আধুনিক ভারতের প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের আশা-আকাজ্ক্ষা, ধ্যান ও কর্ম্মপ্রেরণার এক অপূর্ব্ব ইতিহাস তাঁর কাব্য ও গদ্য রচনার মধ্য দিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর কাব্য পড়ে আমরা মুগ্ধ হই, এবং মোহ মাত্রই মাশুল আদায় করে নেয়। মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র আমাদের কানে ও মনে মধু বর্ষণ করবার বায়না নিয়েই আসরে নেমেছেন। সেটা বড় কম কাজ নয়, কিন্তু তার উপরও কবি কিছু করেছেন যার প্রমাণ তাঁর অগণিত ও অনাদৃত গদ্য রচনার মধ্যে রয়েছে। সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা

করেছেন কবির একনিষ্ঠ ভক্ত ভারতচন্দ্র মজুমদার মহাশয়,—এজন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কত বাধা ও বিঘ্নের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে অবশেষে তাঁর বহু শ্রমসাধ্য গবেষণার ফল এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার মধ্যে দিতে পেরেছেন তা আমি জানি এবং আশা করি দেশের অসংখ্য নরনারীকে যখন কর্ম্মের ক্ষেত্রে নামাবার ও যথার্থ শিক্ষা দেবার সময় আস্‌বে তখন এই ক্ষুদ্র ও অনাড়ম্বর অথচ খাঁটি বইখানি আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের হাতে পৌঁছবে ও কবির কত বড় দান তাঁর গদ্য রচনার মধ্যে রয়েছে তার প্রমাণ আমরা ক্রমশঃ পাব।

শ্রীকালিদাস নাগ

নিবেদন

প্রথমেই বলে রাখতে চাই রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা সম্বন্ধে তাঁর ষোল বছরের সাহিত্য হ'তে আরম্ভ ক'রে এ পর্য্যন্ত, বহু লেখাংশ দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে আমি সংগ্রহ করেচি। সম্প্রতি তারই সামান্য কিছু দিয়ে, ভাবী গ্রন্থের ভূমিকার সামিল ক'রে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিকে পাঠকের কাছে হাজির করলুম। ভবিষ্যতে বৃহদাকারে পৃথক্‌ভাবে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা সম্বন্ধে পূর্ণ সঙ্কলন-পুস্তক সাধারণের কাছে উপস্থিত হবে এই আশা রইল।

রবীন্দ্রনাথকে জান্‌তে হ'লে তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হ'তে হয়, তাই রবীন্দ্র-সাহিত্যই হ'লো এ পথে চল্‌তে প্রধান সহায়। কখন তিনি কি ভাবে দেশের কথা ভেবেচেন, কি ভাবে নানা সমস্যা এসে তাঁর মনে দেখা দিয়েচে, কি ভাবেই বা সমাধানের ইঙ্গিত তিনি সকলকে জানিয়ে দিয়েচেন, দেশের দুর্দ্দশায় কি ভাবে নিজের ব্যথিত প্রাণের সমবেদনায় ও বৈদেশিক অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদে দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েচেন, তার যা কিছু জান্‌বার ও বুঝ্‌বার সুযোগ সুবিধে আমি পেয়েচি, তা' আমার রবীন্দ্র-সাহিত্য চর্চ্চা কর্‌বার দীন-চেষ্টার মধ্য দিয়েই।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক—কবি। তাঁর সঙ্গে দেশের মর্ম্ম সম্বন্ধ না থেকে পারে না। দেশের করুণ ও কঠোর সকল অবস্থাই তাঁর প্রাণকে অল্পবিস্তর দোল দিয়ে গিয়েচে, তিনিও নিত্যনতুন ভাবরাশি জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট ভাষায় বলেচেন ও গ্রন্থে গেঁথে দিয়েচেন;

তাই তাঁকে আমি খুঁজ্‌তে যাইনি অন্য কিছুতে, আমি চেয়েছি তাঁকে তাঁর গ্রন্থরাশির মধ্যে ও আমার দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের শান্তিনিকেতন-বাসে।

জাতিগঠনে রবীন্দ্রনাথ যেমন একদিকে স্বজাতির ও সমাজের দুর্ব্বলতা, হীনতা ও সঙ্কীর্ণতাকে কঠোর হস্তে আঘাত করেছেন, অন্যায়কে অন্যায় ব'লে নিজের ঘরে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন ও মঙ্গলগঠনের পথের সন্ধান দেখিয়ে দিয়েছেন ; তেম্‌নি অন্যদিক দিয়ে স্বজাতির মর্য্যাদা ও বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্যে বিদেশীর সঙ্গে সকল দিক দিয়ে ভাষায়, ভঙ্গীতে ও ভাবের ইঙ্গিতে সংগ্রাম ক'রে জগতের কাছে ভারতের বৃহত্তর মহিমার কথা প্রচার ক'রে ফিরেছেন। সভ্যতায়, সাধনায়, শিক্ষায়, কর্ম্মে ও মহত্ত্বে ভারতবর্ষকে তিনি শ্রেষ্ঠ ক'রে তোল্‌বার জন্যে এবং শ্রেষ্ঠ ক'রে দেখাবার জন্যে, স্বগৃহ হ'তে আরম্ভ ক'রে, সারা বিশ্বে আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে চলেছেন। জগতের ঘরে ঘরে ভারতবর্ষের অন্তরকে পরিচিত ক'রে দেবার জন্যে যে অফুরন্ত মঙ্গলবাণী নিয়ে তিনি বহুবার পরের সঙ্গে পরম আত্মীয়তা সৃষ্টি ক'রে ভারতের মর্য্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন এমন আর করেছেন কয়জন?

অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে আভিজাত্যের দোহাই দিয়ে সাধারণের আত্মীয়সীমা হ'তে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে তাঁকে বিচার করেন, কিন্তু অনেক সময় তথাকথিত সমালোচক ও বিচারকেরা ভুলে যান,—মানুষের যে বিশেষ প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায় তার ভাবের অভিব্যক্তি বা ভাষা-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে—তার অন্তর বিকাশে! রবীন্দ্রনাথের বালককালের ও প্রথম যৌবনের লেখার মধ্যেই স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়, সোশ্যালিজ্‌ম, দরিদ্রপ্রীতি, কৃষকসহানুভূতি ও ধনবৈষম্যের

ব্যথা তাঁর প্রাণে কত করুণ হ'য়ে বেজে উঠেছিল। সেই প্রথম জীবনের অঙ্কুরই বোধ করি পরিণতি লাভ করলো 'রাশিয়ার চিঠি'তে ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রবন্ধে। তা' না হ'লে রবীন্দ্রনাথের কাছে রাশিয়াই বা এত ভাল লাগ্‌বে কেন, রাশিয়ার শিক্ষাদীক্ষা, রাশিয়ার উন্নতিচেষ্টা, রাশিয়ার নির্ধনতার কথাই বা এত বড় সহানুভূতির কণ্ঠে ও এমন হৃদয়াবেগের সহিত তিনি ঘোষণা করবেন কেন? সুদূর উচ্চ আকাশে থেকেও সূর্য্যদেব যেমন বিশ্ববাসীর প্রাণ-তেজের সঙ্গে আপনার সংযোগ রক্ষা ক'রে সার্থকতা সাধন করে, রবীন্দ্রনাথকে আলোচনা করলেও তেমনি দেখতে পাই দুঃখদৈন্যপীড়িত নিরন্ন কোটি কোটি চাষী মুটে মজুরের প্রাণের ব্যথার সঙ্গে, তাঁর হৃদয়ের যোগ বহুকাল ধরেই রয়েছে। অনাথ ও অসহায়কে উপেক্ষা ও উৎসাদন করা রবীন্দ্রনাথের মনোবৃত্তির বিরোধী; বরং তাঁর কবিপ্রাণ অসহায় পতিত নিপীড়িত ও অবনমিতের উদ্ধারের জন্যেই চিরদিন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

ধর্ম্মে, কর্ম্মে, আচারে, ব্যবহারে, অর্থে, সম্পদে ও সভ্যতায় এই মুমূর্ষু জাতিকে, সঞ্জীবনী মন্ত্রের সাহায্যে সাহসী ও স্বাধীন-মনা করে গড়ে তোলবার জন্যে, জাতীয় শিক্ষা বিস্তার করাকেই রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম ব'লে মনে করেন। সরকারী শিক্ষাদানের মূলে যে দাসত্বের অঙ্কুর শিক্ষার্থীর মনে অতর্কিত ভাবে রোপিত হয়ে যায় ও সরকারী উপাধি যে চিরবশ্যতা ও লাঞ্ছনা-কারার স্বেচ্ছাবৃত মোহময় প্রবেশ-পত্র বা প্রকাশ্য অধঃপাতের ললাটতিলক, একথা তিনি নানাভাবে শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তৃত গভীর আলোচনা ক'রে তাঁর উন্নত চিন্তাধারার সঙ্গে পাঠকের মনকে পরিচিত ক'রে দিয়েছেন।

সমগ্র জগতের সংস্পর্শে এসে সভ্যতা ও শিক্ষা যখন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অত্যুদার ভাবে বিস্তৃতি লাভ করতে সুরু করলো, তখন এই ভারতবর্ষে ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য বজায় রাথবার জন্যেই তাঁর আদর্শ সম্মুখে রেখে শান্তিনিকেতনে বিরাট বিশ্বের জ্ঞানকেন্দ্র গ'ড়ে উঠতে লাগলো। এখানে সমগ্র বিশ্বকে আপনার ক'রে নেবার আদর্শ রয়েচে, এখানে প্রাচীন ভারতের তপোবনসুলভ উন্নত তপস্বী-আদর্শের চর্চ্চা ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসীকে প্রাণসম্পদে ভরপুর করে দেবার গভীর চিন্তাধারার পথ প্রশস্ত রয়েচে। সমগ্র জগতের ধ্যানধারণা ও সাধনার ধারা আপনার মধ্যে আপনার মতো ক'রে আয়ত্ত ক'রে নেবার আত্মীয়তাবুদ্ধি অর্জ্জন করাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। পরকে অনুকরণ করা বা অনুসরণ করার দাসসুলভ দুর্ব্বলতা রবীন্দ্র-আদর্শে স্থান পায় না। অপরের শ্রেষ্ঠত্বের প্রাণসম্পদ নিজস্ব প্রাণশক্তির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে একান্ত নিজের ক'রে গ্রহণ করাই রবীন্দ্র-আদর্শের গোড়ার কথা। এই যে আন্তর্জাতিক মৈত্রীবন্ধনের একমাত্র জ্ঞান ও শিক্ষার কেন্দ্র রবীন্দ্রপ্রতিভায় গ'ড়ে উঠেচে ইহা সমগ্র ভারতের গৌরব।

ইহার উদার আদর্শ সম্মুখে রেখে ভারতবাসী আজ সগৌরবে বল্‌তে পারে,—ভারতবর্ষই জগতের জ্ঞানগুরু ও অত্যুদার সভ্যতার পথপ্রদর্শক, পরম আত্মীয় ও মন্ত্র দ্রষ্টা। এই মহীয়সী চিন্তাধারা হতেই ভারতবর্ষ তার হাজার হীনতা ও দৈন্যের নগ্নতা মুহূর্ত্তে ভুলে যেতে পারে। সে মাথা উঁচু করে মহত্বের মহিমায় উন্নত হয়ে স্বাধীনতার মর্য্যাদার জন্যে ভিক্ষাবৃত্তির প্রহসন মন থেকে একেবারে মুছে ফেলে সত্যিকার দাবী নয়ে নির্ভীক ভাবে লড়তে পারে।—সে বল্‌তে পারে—তার অন্তরে যে বিশ্ব-দীপক-সূর্য্যদেব চোখ মেলে আছেন তার আলো কত বড় ও

কত উজ্জ্বল! এবং সেই সূর্য্যকেই আড়াল ক'রে রয়েচে কত ছোট মেঘের টুক্‌রো!

শুধু রবীন্দ্রনাথের জাতীয় ভাবধারা তাঁর নিজস্ব ভাষায় পাঠক-সমাজে পৌঁছিয়ে দেওয়াই ছিল আমার প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু তাঁর লেখার উপরেও আমাকে যে অল্পবিস্তর লেখনী চালাতে হলো, তা আমার প্রবল ইচ্ছার বেগে নয়, প্রয়োজনের তাড়নায় বাধ্য হ'য়ে। অতএব আমার আলোচনা যদি কারো কাছে কোথাও ভাল না লাগতে চায়, তবে তাঁরা যেন মনে করেন—আমার ভাষায় রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ সবটা নাই বা হলো, উদ্ধৃত লেখাংশগুলিই রবীন্দ্রনাথকে জান্‌বার জন্যে তাঁদের কাছে রইল। এতদ্দ্বারা পাঠকের ষোল আনা লোকসান হবে না বলেই আশা করা যেতে পারে।

কবিগুরু বহিখানি পাঠান্তে ইহাকে প্রকাশ করবার জন্যে প্রসন্নচিত্তে অনুমোদন ক'রে তাঁরই উদ্দেশ্যে এ শ্রদ্ধাঞ্জলি-নিবেদনের যে অধিকার আমাকে দিয়েচেন আমি সে মহত্বের মহিমা শ্রদ্ধাবনত মস্তকে স্বীকার করি।

তারপরে ইহার সম্পাদন-ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় ডাঃ কালিদাস নাগ এম-এ, ডি-লিট (প্যারিস) মহাশয়ের নিকট হ'তে যে উৎসাহ ও উপদেশ পেয়েচি তা জীবনে ভুল্‌তে পার্‌ব না। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতার প্রথম অভিবাদন জ্ঞাপন করি।

প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত দেবজ্যোতি বর্ম্মন মহাশয় এ-কাজের গোড়ায় আমাকে যে সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন সে জন্যে তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ রইলুম।

এই কার্য্যগতিকে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, রামমোহন লাইব্রেরী ও সারস্বত লাইব্রেরীতে ব'সে ব'সে আমার অনেক দিনের অনেক সময় কেটেচে, তাই তা'দিকেও ভোলা যায় না।

ইহা ছাড়া শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ও অন্যান্য যাঁরা আমাকে একাজে সাহায্য ও সহানুভূতি দেখিয়ে বন্ধুর কাজ করেচেন তাঁদের প্রতিও আমার নমস্কার রইল।

রবীন্দ্র জয়ন্তী
পৌষ, ১৩৩৮
কলিকাতা

শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার

জাতিগঠনে রবীন্দ্রনাথ

দেশ-বিদেশে রবীন্দ্রনাথ

জগতে সাধারণতঃ বহু লোকের মধ্যেই দেখা যায় তাঁরা নিজের অবস্থার গণ্ডীকে অতিক্রম ক'রে প্রায়ই পরের সুখদুঃখকে বড় ক'রে হৃদয়ে অনুভব করতে পারেন না। অবস্থাগতিকে নিজের জীবনে আগত আঘাত ও আরামের কান্নাহাসি দিয়েই জগতকে তাঁরা বিচার ক'রে থাকেন; কিন্তু স্পষ্ট ক'রে তাঁরা বুঝতে পারেন না যে, আরো কত সহস্র সহস্র মানুষের মনে প্রতিনিয়ত কত বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত বিবিধ বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করে, এবং তাহার উপরেই একটা জাতির বা সমাজের ভাগ্য কতটা বেশি নির্ভর করে। যাঁরা সাধারণ মানুষের সঙ্কীর্ণ সীমা হতে আত্মপ্রসারিত করতে পেরেচেন ও নিজেকে বহুর মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েচেন, পরের হৃদয়ের সঙ্গে তাঁদের হৃদয়ের সহানুভূতি-পূর্ণ একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ হয়ে গিয়েচে। এখানে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়েও আমরা সেদিক দিয়ে দেখ্‌তে পাই—যদিও রবীন্দ্রনাথ প্রচুর ধনসম্পদের মধ্যে লালিতপালিত ও বর্দ্ধিত, তথাপি দরিদ্র পল্লীবাসীর প্রাণের ব্যথা সকল সময়েই তাঁর প্রাণকে কত চঞ্চল ক'রে তুলেচে। কিসে তাদের পেটের ভাতের সহজ সংস্থান হবে, কিসে তারা শিক্ষিত ও সভ্য হ'য়ে এই পরাধীনতার গুরুভার পাষাণ বুক থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে মাথা উঁচু ক'রে ভারতের গৌরব ঘোষণা করতে শিখবে, সর্ব্বদাই তিনি এ সব সম্বন্ধে কত ভাবেন!

—দেশের মধ্যে পরস্পরে পরস্পরকে ভাই ব'লে সাহায্য বা সহানুভূতি দেখাতে জানে না, প্রায় সকলেই নিজেকে আড়াল ক'রে—হীন জঘন্য বৃত্তিতে আত্মসুখের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে, জাতীয় জীবনে এই যে একটি ভীষণ কলঙ্ক তা মুছে ফেল্‌তে হবে। এই বিরাট জাতিকে উদ্বুদ্ধ কর্‌তে হ'লে, এদের প্রাণে শক্তি সঞ্চার কর্‌তে হ'লে বা দেশাত্ম-বোধ জাগিয়ে তুল্‌তে হ'লে, শুধু পলিটিক্যাল বক্তার বক্তৃতায়ও হবে না, ভিক্ষালব্ধ আইনকানুনের দ্বারাও হবে না। পল্লীজীবনের সঙ্গে জীবনের মিল রেখে যে পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ নিরন্ন, দুস্থ, দুর্ব্বল, অসহায় ও বিদেশীর দ্বারা লাঞ্ছিত দেশের লোককে দেশসেবকেরা ভাই ব'লে, আত্মীয় ব'লে উদ্ধার করবার দায়িত্ব হাতেকলমে গ্রহণ না কর্‌বে, সে পর্য্যন্ত গলাবাজি ক'রে বড় বড় বক্তৃতা ঝেড়ে মাথা ভাঙলেও ওদের মাথায় কিছুই ঢুক্‌বে না। তাই প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ এই দুর্ভাগা জাতির মঙ্গলের জন্যে সারগর্ভ উক্তিতে দেশসেবকের পথের চিহ্ন এঁকে দিয়েছিলেন—

"আমাদের দেশের বাগীশবর্গ বলেন, agitate কর, অর্থাৎ বাক্‌যন্ত্রটাকে এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম দিয়ো না। ইল্‌বর্ট বিল্‌ ও লোকেল সেল্‌ফ্‌ গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে পাড়ায় পাড়ায় বক্তৃতা করিয়া বেড়াও। তাহার একটা ফল এই হইবে যে, লোকেদের মধ্যে পলিটিক্যাল এডুকেশন বিস্তৃত হইবে। স্বদেশের হিত কাহাকে বলে লোকে তাহাই শিখিবে। ইত্যাদি। কিন্তু ইন্দ্রদেবের ন্যায় আকাশের মেঘের মধ্যে থাকিয়া মর্ত্ত্যবাসীদের পরম উপকার করিবার জন্য কনষ্টিটিউসানেল্‌ হিষ্ট্রি পড়া, ইংরাজি বক্তৃতার শিলা-বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া তাহাদের মাথা ভাঙিয়া দিলেও তাহাদের মস্তিষ্কের মধ্যে

"পলিটিক্যাল এডুকেশন" প্রবেশ করে কি-না সন্দেহ। আমি বোধ করি ঐ সকল শিক্ষা ঘরের ভিতর হইতে হয়, অত্যন্ত পরিপক্ক লাউ কুমড়ার মতন চালের উপর হইতে গড়াইয়া পড়ে না! যতবার মফস্বলে একজন ইংরাজ একজন দেশীয়ের প্রতি অত্যাচার করে, যতবার সেই দেশীয়ের পরাভব হয়, যতবার সে অদৃষ্টের মুখ চাহিয়া সেই অত্যাচার ও পরাভব নীরবে সহ্য করিয়া যায়, যতবার সে নিজকে সর্ব্বতোভাবে অসহায় বলিয়া অনুভব করে, ততবারই যে আমাদের দেশ দাসত্বের গহ্বরে এক পা এক পা করিয়া আরো নাবিতে থাকে। কেবল কতকগুলা মুখের কথায় তুমি তাহাকে আত্মমর্য্যাদা শিক্ষা দিবে কি করিয়া। যাহার গৃহের সম্ভ্রম প্রতিদিন নষ্ট হইতেছে, তুমি তাহাকে লোকাল সেল্‌ফ্‌-গবর্ণমেণ্টের মাচার উপর চড়াইয়া কি আর রাজা করিবে বল! ঘরে যাহার হাঁড়ি চড়ে না, তুমি তাহার ছবির হাতে একটি টাকার তোড়া আঁকিয়া তাহার ক্ষুধার যন্ত্রণা কিরূপে নিবারণ করিবে। যাহারা নিজের সম্ভ্রম রক্ষার বিষয়ে হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছে, শাসনকর্ত্তাদের ভয়ে যাহাদের অহর্নিশি নাড়ী ঠক্‌ ঠক্‌ করিতেছে তাহাদের হাতে শাসনভার দিতে যাওয়া নিষ্ঠুর বিদ্রূপ বলিয়া বোধ হয়। শিক্ষা দিতে চাও ত এক কাজ কর; একবার একজন ইংরাজের হাত হইতে একজন দেশীয়কে ত্রাণ কর, একবার সে বুঝিতে পারুক ইংরাজ ও অদৃষ্ট একই ব্যক্তি নহে, একবার সে হৃদয়ের মধ্যে জয়গর্ব্ব অনুভব করুক, একবার তাহার হৃদয়ের ন্যায্য প্রতিশোধ-স্পৃহা চরিতার্থ হউক। তখন আমাদের দেশের লোকের আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান বাস্তবিক হৃদয়ের মধ্যে অঙ্কুরিত হইতে থাকিবে, সে জ্ঞান যদি

হৃদয়ের মধ্যে বদ্ধমূল না হয় তবে জাতির উন্নতি কোথা
ইংরাজেরা যে আমাদের পশুর ন্যায় জ্ঞান করে, ও তাহা ব্যবহ
ক্রমাগত প্রকাশ করে, ড্যাম নিগর বলিয়া সম্বোধন ক
ও কটাক্ষপাতে কাঁপাইয়া তোলে, ইহার যে কুফল তাহার প্র
বিধান কিসে হইবে? Agitate করিয়া দরখাস্ত করিয়া এ
সুবিধাজনক আইন পাশ করাইয়া যেটুকু লাভ, তাহাতে
লোকসান পূরণ করিতে পারে না। ইংরাজের প্রতিদিন
ব্যবহারগত যথেচ্ছাচারিতা দমন করিয়া যখন দেশের লো
আপনাদিগকে কতকটা তাহাদের সমকক্ষ জ্ঞান করিবে, ত
আমাদের যথার্থ উন্নতি আরম্ভ হইবে, দাসত্বের থর থর
দূর হইবে, ও আমরা নতশির আকাশের দিকে তুলিতে পা
সে কখন হইবে, যখন আমাদের দেশের সাধারণ লোকে
ইংরাজের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া কথঞ্চিৎ আত্ম
প্রত্যাশা করিতে পারিবে। সে শুভ দিনই বা কখন আ
যখন স্বদেশের লোক স্বদেশের লোকের সাহায্য করিবে। এ
শিক্ষা, এই যথার্থ শিক্ষা, এ জিহ্বার ব্যায়াম-শিক্ষা নহে,
স্বদেশহিতৈষিতার প্রকৃত চর্চ্চা।

আমরা যখন স্বদেশীয় বিপন্নদের সাহায্য করিতে অগ্রসর
তখন আমাদের আর এক মহৎ উপকার হইবে। তখন আ
দেশের লোক স্বদেশ কাহাকে বলে বুঝিতে পারিবে। স্ব
প্রেম প্রভৃতি কথা আমরা বিদেশীদের কাছ হইতে শিখি
কিন্তু স্বদেশীদের কাছ হইতে আজিও শিখিতে পারি নাই। ত
কারণ, আমরা স্বদেশপ্রেম দেখিতে পাই না। আমাদের চারি
জড়তা, নিশ্চেষ্টতা, হৃদয়ের অভাব। কেহ কাহারও সাড়া পা

কেহ কাহারও সাহায্য পাই না, কেহ বলে না মাভৈঃ! এমন শ্মশানক্ষেত্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া ইহাকেও গৃহ মনে করা অসাধারণ কল্পনার কাজ! আমি উপবাসে মরিয়া গেলেও আমাকে এক মুঠা অন্ন দেয় না, আমাকে বাহিরের লোক আক্রমণ করিলে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখে, আমার পরম বিপদের সময়েও আমার সম্মুখে বসিয়া স্বচ্ছন্দে নৃত্যগীত উৎসব করে, তাহাদিগকে আমার আত্মীয় পরিবার মনে করিতে হইবে; কেন করিতে হইবে? না, সহরের কলেজ হইতে একজন বক্তা আসিয়া অত্যন্ত উর্দ্ধকণ্ঠে বলিতেছেন তাহাই মনে করা উচিত। আমাকে যদি একজন ইংরাজ পথে অন্যায় ভাবে প্রহার করে, তবে সেই বক্তাই পাশ কাটাইয়া চলিয়া যান। সে সময়ে কি আমরা আমাদের স্বদেশের কোন লোকের সাহায্য প্রত্যাশা করি। স্বদেশীয়দের মধ্যে আমরা যেমন অসহায়—এমন আর কোথাও নই! এইজন্যই বলিতেছি, যদি স্বদেশপ্রেম শিক্ষা দিতে হয় তবে সে পিতামহদের উল্লেখ করিয়া সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র বিকম্পিত করিয়া agitate করিয়া বেড়াইলে হইবে না। হাতেকলমে এক একজন করিয়া স্বদেশীয়দের সাহায্য করিতে হইবে। যে কৃষক নাগরিক মহাশয়ের উদ্দীপক বক্তৃতা ও জাতীয় সঙ্গীত শুনিয়া প্রথমে হাঁ করিয়াছিল, তাহার পর হাই তুলিয়াছিল, তার পরে চোখ বুজিয়াছিল, অবশেষে বাড়ী ফিরিয়া গিয়া স্ত্রীকে সংবাদ দিয়াছিল যে, কলিকাতার বাবু সত্যপীরের গান করিতে আসিয়াছেন, সে-ই যখন বিপদের সময়, অকূল পাথারে ডুবিবার সময় দেখিবে তাহার স্বদেশীয় দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছে, তখন তাহার যে শিক্ষা হইবে সে শিক্ষার বিনাশ নাই।

আমাদের সন্তানরা যখন দেখিবে চারিদিকে স্বদেশীয়েরা সাহ
করিতেছে, তখন কি আর স্বদেশপ্রেম নামক কথাটা তাহাদিগ
ইংরাজের গ্রন্থ হইতে শিখিতে হইবে! তখন সেই ভাব তাহ
পিতার কাছে শিখিবে, মাতার কাছে শিখিবে, ভ্রাতার কা
শিখিবে, সঙ্গীদের কাছে শিখিবে। কাজ দেখিয়া শিখিবে, ব
শুনিয়া শিখিবে না। তখন আমাদের দেশের সম্ভ্রমরক্ষা হই
আমাদের আত্মমর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে; তখন আমরা স্বদে
বাস করিব, স্বজাতিকে ভাই বলিব। আজ আমরা বিদে
আছি, বিদেশীয়দের হাজতে আছি, আমাদের সম্ভ্রমই বা
আস্ফালনই বা কি! আমাদের স্বজাতি যখন আমাদিগকে স্বজ
বলিয়া জানে না, তখন কাহার কাছে কোন্ চুলায় আ
agitate করিতে যাইব!" (হাতেকলমে, ভারতী—১২৯১)

পলিটিক্যাল্ আন্দোলন ক্রমে যখন দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়
সুরু কর্‌লো, তখন বোঝা গেলো, এক শ্রেণীর লোকের প্র
স্বাধীনতার জন্যে একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগেচে ও পরাধীনতার জ
তাদের প্রাণকে বিষিয়ে দিয়েচে, কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে পল্লীর অ
অন্দরে পর্য্যন্ত আর একটি বৈদেশিক হীনতার প্রভাবকেও
অলক্ষ্যে আমাদের পলিটিশিয়ানরাই যে বিচ্ছুরিত করে দিচ্ছি
সেদিকে তাঁদের বড় একটা খেয়াল ছিল না এবং তার প্র
ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ভারতবর্ষের অশিক্ষিত সহজ
জনসাধারণকে আধ্যাত্মিক পথে অধঃপাতিত ক'রে দেবার পথ পরি
কর্‌তে চলেছিলো। তখনকার বিজ্ঞেরা কার্য্যগতিকে উদ্দেশ্য সি
জন্যে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ কর্‌তে কিম্বা সত্যকে বিকৃত ক'রে, কপট

আশ্রয় নিয়ে, ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য কর্‌তে কুণ্ঠিত হতেন না বরং ইহাকেই নিজেদের পলিটিক্যাল নীতি বলে জাহির কর্‌তেন ও মানব জীবনের সহজিয়া বুদ্ধির গৌরব ক'রে বেড়াতেন। ইহার দ্বারা যে মানবাত্মার তপস্যা, সাধনা ও দৃঢ়তাকে নষ্ট ক'রে মানুষকে নিতান্ত সস্তা ও শক্তিহীন ক'রে তোলে—তা তাঁরা ভাব্‌তেন না। ভারতের এই অস্বাভাবিক সাধনার পথে রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যতের আশঙ্কায় বিচলিত হ'য়ে বলেছিলেন—

"সুবিধার অনুরোধে সমাজের ভিত্তিভূমিতে যাঁহারা ছিদ্র খনন করেন তাঁহারা অনেকে আপনাদিগকে বিজ্ঞ political বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা এমন ভাব প্রকাশ করেন যে, মিথ্যা কথা বলা খারাপ, কিন্তু political ব্যাপারে মিথ্যাকথা বলিতে দোষ নাই। সত্য ঘটনা বিকৃত করিয়া বলা উচিত নহে, কিন্তু তাহা করিলে যদি কোন ইংরাজ অপদস্থ হয় তবে তাহাতে দোষ নাই। কপটতা আচরণ ধর্ম্মবিরুদ্ধ, কিন্তু দেশের আবশ্যক বিবেচনা করিয়া বৃহৎ উদ্দেশ্যে কপটতা আচরণ অন্যায় নহে। কিন্তু বৃহৎ কাহাকে বল? উদ্দেশ্য যতই বৃহৎ হউক না কেন, তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর উদ্দেশ্য আছে। বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়া বৃহত্তর উদ্দেশ্য ধ্বংস হইয়া যায় যে! হইতেও পারে সমস্ত জাতিকে মিথ্যাচরণ করিতে শিখাইলে আজিকার মত একটা সুবিধার সুযোগ হইল—কিন্তু তাহাকে যদি দৃঢ় সত্যানুরাগ ও ন্যায়ানুরাগ শিখাইতে তাহা হইলে সে যে চিরদিনের মত মানুষ হইতে পারিত! সে যে নির্ভয়ে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত, তাহার হৃদয়ে যে অসীম বল জন্মাইত। তাহা ছাড়া

সংসারের কার্য্য আমাদের অধীন নহে। আমরা যদি কেবলমাত্র একটি সূচি অনুসন্ধান করিবার জন্য দীপ জালাই সে সমস্ত ঘর আলো করিবে তেমনি আমরা যদি একটি সূচি গোপন করিবার জন্য আলো নিবাইয়া দিই, তবে তাহাতে সমস্ত ঘর অন্ধকার হইবে,—তেমনি আমরা যদি সমস্ত জাতিকে কোন উপকার সাধনের জন্য মিথ্যাচরণ শিখাই তবে সেই মিথ্যাচরণ যে তোমার ইচ্ছার অনুসরণ করিয়া কেবল মাত্র উপকারটুকু করিয়াই অন্তর্হিত হইবে তাহা নহে, তাহার বংশ সে স্থাপনা করিয়া যাইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বৃহত্ত্ব একটি মাত্র উদ্দেশ্যের মধ্যে বদ্ধ থাকে না, তাহার দ্বারা সহস্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সূর্য্যকিরণ উত্তাপ দেয়, আলোক দেয়, বর্ণ দেয়, জড় উদ্ভিদ্ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলেরই উপরে তাহার সহস্র প্রকারের প্রভাব কার্য্য করে, তোমার যদি এক সময়ে খেয়াল হয় যে, পৃথিবীতে সবুজ বর্ণের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, অতএব সেটা নিবারণ করা আবশ্যক ও এই পরম লোকহিতকর উদ্দেশ্যে যদি একটা আকাশজোড়া ছাতা তুলিয়া ধর তবে সবুজ রং তিরোহিত হইতেও পারে কিন্তু সেই সঙ্গে লাল রং, নীল রং, সমুদয় রং মারা যাইবে, পৃথিবীর উত্তাপ যাইবে, আলোক যাইবে, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সবাই মিলিয়া মরিয়া পড়িবে। তেমনি কেবলমাত্র political উদ্দেশ্যের মধ্যেই সত্য বদ্ধ নহে। তাহার প্রভাব মনুষ্য-সমাজের অস্থিমজ্জার মধ্যে সহস্র আকারে কার্য্য করিতেছে—একটি মাত্র উদ্দেশ্যবিশেষের উপযোগী করিয়া যদি তাহার পরিবর্ত্তন কর, তবে সে আর শত সহস্র উদ্দেশ্যের পক্ষে অনুপযোগী হইয়া পড়িবে। যেখানে যত সমাজের ধ্বংস

হইয়াছে এইরূপ করিয়াই হইয়াছে। যখনই মতিভ্রমবশতঃ একটি সঙ্কীর্ণ হিত সমাজের চক্ষে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছে এবং অনন্ত হিতকে সে তাহার নিকটে বলিদান দিয়াছে, তখনি সেই সমাজের মধ্যে শনি প্রবেশ করিয়াছে, তাহার কলি ঘনাইয়া আসিয়াছে। একটি বস্তা সর্ষপের সদ্গতি করিতে গিয়া ভরা-নৌকা ডুবাইলে বাণিজ্যের যেরূপ উন্নতি হয় উপরিউক্ত সমাজের সেইরূপ উন্নতি হইয়া থাকে। অতএব স্বজাতির যথার্থ উন্নতি যদি প্রার্থনীয় হয় তবে কলকৌশল, ধূর্ত্ততা, চাণক্যতা পরিহার করিয়া যথার্থ পুরুষের মত মানুষের মহত্ত্বের সরল রাজপথে চলিতে হইবে, তাহাতে গম্য স্থানে পৌঁছাইতে যদি বিলম্ব হয় তাহাও শ্রেয়, তথাপি সুরঙ্গ পথে অতি সত্বরে রসাতলরাজ্যে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করা সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্য।"

(একটি পুরাতন কথা, ভারতী—১২৯১)

সুবিধাবাদীদিগের পলিটিক্যাল-পথের জঘন্য সঙ্কীর্ণতা মানুষকে কিম্বা মানব-সমাজকে হীনতার অনুশীলনের মধ্য দিয়ে দিনে দিনে অন্তরের দিকে ছোট ক'রে তোলে ও মানুষের মনুষ্যত্বকে নষ্ট ক'রে দেয়। চিরদিন সে সকল মন অটল হয়ে শক্ত হয়ে আপনাকে সাধনার পথে স্থির ক'রে রাখতে পারে না। তারা আপনার উদারতাকে হারিয়ে ফেলে ও সকল সময় নিজহাতে গড়া নিজের সঙ্কোচের ছিদ্রপথে সন্ত্রস্ত হ'য়ে পাহারায় নিযুক্ত থাকে। তাদের স্বাধীনতা তাদের শান্তির জন্যে নয়, শুধু বিজয়ের গৌরবের জন্যে। রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়ভাবে হাজার রকম বাজে নজির ও ভ্রান্ত অপবাদের বিরুদ্ধে সত্যকে বড় ক'রে দেখেই বলেছিলেন—

"যেমন করিয়াই দেখি, সঙ্কীর্ণতা মঙ্গলের কারণ নহে। জীবনের আদর্শকে সীমাবদ্ধ করিয়া কখনই জাতির উন্নতি হইবে না। উদারতা না হইলে কখনই মহত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হইবে না। মুখশ্রীতে যে একটি দীপ্তির বিভাস হয়, হৃদয়ের মধ্যে যে একটি প্রতিভার বিকাশ হয়, সমস্ত জীবন যে সংসার-তরঙ্গের মধ্যে অটল অচলের ন্যায় মাথা তুলিয়া জাগিয়া থাকে সে কেবল একটি বিপুল উদারতাকে আশ্রয় করিয়া। সঙ্কোচের মধ্যে গেলেই রোগে জীর্ণ, শোকে শীর্ণ, ভয়ে ভীত, দাসত্বে নতশির, অপমানে নিরুপায় হইয়া থাকিতে হয়, চোখ তুলিয়া চাহিতে পারা যায় না, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না, কাপুরুষতার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন মিথ্যাচরণ কপটতা তোষামোদ জীবনের সম্বল হইয়া পড়ে। অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিরা কাপুরুষতার আশ্রয়স্থল এই হীন মিথ্যাকে সবলে সমূলে উৎপাটন না করিয়া যদি তাহার বীজ গোপনে বপন করেন তবে সমাজের ঘোরতর অমঙ্গলের আশঙ্কায় হতাশ্বাস হইয়া পড়িতে হয়। যিনি যাহা বলুন, পরম সত্যবাদী বলিয়া আমাদিগকে উপহাসই করুন, sentimental বলিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞাই করুন বা শ্রীকৃষ্ণের দোহাই দিন, এ মিথ্যাকে আমরা কখনই ঘরে থাকিতে দিব না, ইহাকে আমরা বিসর্জ্জন দিয়া আসিব। সুবিধাই হউক লাভই হউক আত্মহিতই হউক মিথ্যা বলিব না, মিথ্যাচরণ করিব না, সত্যের ভাণ করিব না, আত্মপ্রবঞ্চনা করিব না—সত্যকে আশ্রয় করিয়া মহত্ত্বে উন্নত হইয়া সরলভাবে দাঁড়াইয়া ঝড় সহ্য করিব সেও ভাল, তবু মিথ্যায় সঙ্কুচিত হইয়া সুবিধার গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিরাপদ সুখ অনুভব করিবার অভিলাষে আত্মার কবর রচনা করিব না।" (ভারতী—১২৯১)

শৈশবে অনেক ভুল ত্রুটি ও অনেক দোষ দৈন্য থাকে, তাই ভারতবর্ষের রাজনীতির শৈশবজীবনে ইহার সঙ্গে বহুরকম দৈন্য জড়িত ছিল। রাজনীতির প্রথম অধ্যায়ে বহুলোক নেতৃত্বের বাহাদুরীর জন্যে ও ফাঁকি দিয়ে নাম কেনার উদ্দেশ্যে জাতীয় আন্দোলনে আস্ফালন করতেন, আবার তাঁদেরই অনেকে আন্দোলনের কঠোরতর অবস্থায়, ত্যাগের আহ্বানের সময় স'রে পড়তেন। (অবশ্য এ কলঙ্ক অল্পবিস্তর সকল সময়েই রয়েচে)। দৃঢ় চরিত্রবলের নিদর্শন প্রায়ই যখন দেখা যেতো না পরস্পরে নামের জন্যে দ্বেষাদ্বেষী বিদ্রূপের জাল বুন্‌তেন—আর বহুবিধ কৃত্রিমতায় নিজেদের দুর্ব্বল শক্তিকে আরো দুর্ব্বল ক'রে তুল্‌তেন, তখন রবীন্দ্রনাথ কত পরিষ্কার ভাবে ভবিষ্যৎ পথের কথা জেনেছিলেন ও কেমন উপযুক্ত অভিভাবকের মত কঠোর ভাবে এ সমস্ত অন্যায়ের সমালোচনা ক'রে দুর্ব্বলের দুর্ব্বলতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সত্যকার পথের সন্ধান জানিয়ে দিয়েছিলেন!

শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের তপস্যার মত তপস্যাপরায়ণ, নাম যশে অনাসক্ত, দুর্দ্দম, প্রাণপূর্ণ, একনিষ্ঠ সত্য সাধকই আস্‌বেন ভারতের ভাবী ভাগ্যনিয়ন্তা রাজনীতিক গুরু। তাঁর বিশ্বগ্রাহী হৃদয় দিয়ে তিনি সমস্ত অসাধ্য সাধন কর্‌বার ব্রত নিবেন। এই ভবিষ্যতের বাণীবলে রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিকদিগের প্রতি প্রকাশ্য নীতির ইঙ্গিত প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে দিয়ে গিয়েচেন। আজ আমরা তারই যেন একটা জীবন্ত আদর্শ ও কর্ম্মধারা দেখতে পাচ্ছি মহাত্মা গান্ধীর মধ্য দিয়ে।

"আমরা আজ পৃথিবীর রণভূমিতে কি অস্ত্র লইয়া আসিয়া দাঁড়াইলাম? কেবল বক্তৃতা এবং আবেদন? কি চর্ম্ম পরিয়া আত্মরক্ষা করিতে

চাহিতেছি? কেবল ছদ্মবেশ? এমন করিয়া কতদিনই বা কাজ চলে এবং কতটুকুই বা ফল হয়?

একবার নিজেদের মধ্যে অকপট চিত্তে সরলভাবে স্বীকার করিতে দোষ কি, যে, এখনো আমাদের চরিত্রবল জমে নাই? আমরা দলাদলি ঈর্ষা ক্ষুদ্রতায় জীর্ণ। আমরা একত্র হইতে পারি না, পরস্পরকে বিশ্বাস করি না, আপনাদের মধ্যে কাহারও নেতৃত্ব স্বীকার করিতে চাহি না। আমাদের বৃহৎ অনুষ্ঠানগুলি বৃহৎ বুদ্বুদের মত ফুটিয়া যায়; আরম্ভে ব্যাপারটা খুব তেজের সহিত উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে, দুদিন পরেই সেটা প্রথমে বিচ্ছিন্ন, পরে বিকৃত, পরে নির্জ্জীব হইয়া যায়। যতক্ষণ না যথার্থ ত্যাগ-স্বীকারের সময় আসে ততক্ষণ আমরা ক্রীড়াসক্ত বালকের মত একটা উদ্যোগ লইয়া উন্মত্ত থাকি, তারপরে কিঞ্চিৎ ত্যাগের সময় উপস্থিত হইলেই আমরা নানান ছুতায় স্ব স্ব গৃহে সরিয়া পড়ি। আত্মাভিমান কোন কারণে তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হইলে উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের আর কোন জ্ঞান থাকে না। যেমন করিয়া হৌক্ কাজ আরম্ভ হইতে না হইতেই তপ্ত তপ্ত নামটা চাই। বিজ্ঞাপন, রিপোর্ট, ধূমধাম এবং খ্যাতিটা যথেষ্ট পরিমাণে হইলেই আমাদের এমনি পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি বোধ হয় যে, তাহার পরেই প্রকৃতিটা নিদ্রালস হইয়া আসে; ধৈর্য্যসাধ্য শ্রমসাধ্য কাজে হাত দিতে আর তেমন গা লাগে না।

এই দুর্ব্বল অপরিণত শত জীর্ণ চরিত্রটা লইয়া আমরা কি সাহসে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি তাহাই বিস্ময় এবং ভাবনার বিষয়।

এরূপ অবস্থায় অসম্পূর্ণতা সংশোধন না করিয়া অসম্পূর্ণতা গোপন করিতেই ইচ্ছা যায়। একটা কোন আত্মদোষের সমালোচনা করিতে গেলেই সকলে মিলিয়া মুখ চাপিয়া ধরে, বলে, আরে চুপ চুপ, ইংরাজেরা শুনিতে পাইবে—তাহারা কি মনে করিবে?"

* * * *

"শিখদিগের শেষ গুরু গুরুগোবিন্দ যেমন বহুকাল জনহীন দুর্গম স্থানে বাস করিয়া নানা জাতির নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সুদীর্ঘ অবসর লইয়া আত্মোন্নতি সাধনপূর্ব্বক তাহার পর নির্জ্জন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আপনার গুরুপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি আমাদের যিনি গুরু হইবেন তাঁহাকেও খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাত বাস যাপন করিতে হইবে, পরম ধৈর্য্যের সহিত গভীর চিন্তায় নানা দেশের বিজ্ঞানে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, সমস্ত দেশ অনিবার্য্য বেগে অন্ধভাবে যে আকর্ষণে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে সেই আকর্ষণ হইতে বহু যত্নে আপনাকে দূরে রক্ষা করিয়া পরিষ্কার সুস্পষ্টরূপে হিতাহিত জ্ঞানকে অর্জ্জন ও মার্জ্জন করিতে হইবে তাহার পরে তিনি বাহির হইয়া আসিয়া যখন আমাদের চিরপরিচিত ভাষায় আমাদিগকে আহ্বান করিবেন, আদেশ করিবেন, তখন আর কিছু না হৌক সহসা চৈতন্য হইবে—এতদিন আমাদের একটা ভ্রম হইয়াছিল, আমরা একটা স্বপ্নের বশবর্ত্তী হইয়া চোখ বুজিয়া সঙ্কটের পথে চলিয়াছিলাম, সেইটাই পতনের উপত্যকা।

আমাদের সেই গুরুদেব আজিকার দিনের এই উদ্‌ভ্রান্ত কোলাহলের মধ্যে নাই, তিনি মান চাহিতেছেন না, পদ চাহিতেছেন না, ইংরাজি কাগজের রিপোর্ট চাহিতেছেন না, তিনি সমস্ত মত্ততা হইতে, মূঢ় জনস্রোতের আবর্ত্ত হইতে আপনাকে সযত্নে রক্ষা করিতেছেন, কোন একটি বিশেষ আইন-সংশোধন বা বিশেষ সভায় স্থান পাইয়া আমাদের দেশের কোন যথার্থ দুর্গতি দূর হইবে আশা করিতেছেন না। তিনি নিভৃতে শিক্ষা করিতেছেন এবং একান্তে চিন্তা করিতেছেন; আপনার জীবনকে মহোচ্চ আদর্শে অটল উন্নত করিয়া তুলিয়া চারিদিকের জনমণ্ডলীকে অলক্ষ্যে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি চতুর্দ্দিককে যেন উদার বিশ্বগ্রাহী হৃদয় দিয়া নীরবে শোষণ করিয়া লইতেছেন; এবং বঙ্গলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি স্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া দেবতার নিকট একান্ত মনে প্রার্থনা করিতেছেন যেন এখনকার দিনের মিথ্যা তর্ক ও বাঁধি কথায় তাঁহাকে কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট না করে এবং দেশের লোকের বিশ্বাসহীন নিষ্ঠাহীনতায়, উদ্দেশ্যসাধন অসাধ্য বলিয়া তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিয়া না দেয়। অসাধ্য বটে, কিন্তু এদেশের যিনি উন্নতি করিবেন অসাধ্য সাধনই তাঁহার ব্রত।” (সাধনা—১৩০০)

ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাতে ভারতের জাতীয় জীবনে যদি এত বেশী দুর্ব্বলতা থাকে, তবে আঘাতের পরে আঘাত এসে এ জাতির অস্তিত্ব একেবারে নষ্ট ক'রে ফেল্‌বে। যে শক্তি আমাদিগকে হীন ও দুর্ব্বল ক'রে রেখেচে, তার কাছে যদি আমরা আমাদের হীনতা ঝেড়ে ফেলে বলিষ্ঠ মনে দাঁড়াতে পারি তবেই তার শ্রদ্ধার দৃষ্টি আমাদের ওপর পড়বে ও তখন থেকেই আমাদের আশার

দিনের অভ্যুদয় হবে, আমরা রাজার কাছে সুবিচারের প্রত্যাশা করতে পারব। অতএব সে জন্যে গঠিত হ'তে হ'লে যেমন একদিক দিয়ে জাতীয় জীবনের অন্তরের দিকে গ'ড়ে উঠতে হবে, তেমনি আবার বাহির দিকে সংঘশক্তি গড়ে তোল্‌বার দরকার আছে। এই সংঘ অহর্নিশি আঘাতে আঘাতে অনেক ভাঙচুর হ'য়ে যাবে সত্য, কিন্তু তথাপি ইহার ভিতর থেকে যখন দেখা যাবে আগুনে পুড়ে, জলে ডুবেও দু-চারটি প্রাণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে আদর্শকে শক্ত ক'রে ধরে রয়েচে, তখনি অন্যায়শক্তির টনক নড়বে, শ্রদ্ধায় তার মাথা নত হয়ে আস্‌বে। রবীন্দ্রনাথ এক সময় এই সুবিচারের অধিকারের কথা চিন্তা করেই বলেছিলেন—

“স্বাভাবিক নিয়মানুগত আঘাতপরম্পরাকে যদি অর্দ্ধপথে বাধা দিতে হয় তবে আমাদিগকেও বাঁধ বাঁধিতে হইবে। সকলকে এক হইতে হইবে। সকলকে সম হৃদয় হইয়া সমবেদনা অনুভব করিতে হইবে।

দল বাঁধিয়া যে বিপ্লব করিতে হইবে তাহা নহে—আমাদের সে শক্তিও নাই। কিন্তু বাঁধিলে যে একটা বৃহত্ত্ব এবং বল লাভ করা যায় তাহাকে লোকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারে না। শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে না পারিলে সুবিচার আকর্ষণ করা বড় কঠিন।

কিন্তু বালির বাঁধ বাঁধিবে কি করিয়া? যাহারা বার বার নিহত পরাহত হইয়াছে অথচ কোন কালে সংহত হইতে শিখে নাই, যাহাদের সমাজের মধ্যে অনৈক্যের সহস্র বিষবীজ নিহিত রহিয়াছে তাহাদিগকে কিসে বাঁধিতে পারিবে? ইংরাজ যে আমাদের মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতে পারে না এবং ইংরাজ ঔষধের

দ্বারা চিকিৎসার চেষ্টা না করিয়া কঠিন আঘাতের দ্বারা আমাদে
হৃদয়ব্যথা চতুর্গুণ বর্দ্ধিত করিবার উদ্যোগ করিতেছে এই বিশ্বা
উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে সমস্ত হিন্দু জাতি
হৃদয় অলক্ষিতভাবে প্রতিদিন পরস্পরের নিকটে আকৃষ্ট হইয়
আসিতেছে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। আমাদের স্বজাতি
এখনো আমাদের স্বজাতীয়ের পক্ষে ধ্রুব আশ্রয়ভূমি হইয়া উঠিত
পারে নাই। এই জন্য বাহিরে ঝটিকা অপেক্ষা আমাদে
গৃহভিত্তির বালুকাময় প্রতিষ্ঠাস্থানকে অধিক আশঙ্কা করি
খরবেগ নদীর মধ্যস্রোত অপেক্ষা তাহার শিথিল বন্ধন ভগ্নপ্রব
তটভূমিকে পরিহার করিয়া চলিতে হয়।

আমরা জানি বহুকাল পরাধীনতায় পিষ্ট হইয়া আমাদে
জাতীয় মনুষ্যত্ব ও সাহস চূর্ণ হইয়া গেছে, আমরা জানি যে
অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি দণ্ডায়মান হইতে হয় তবে সর্ব্বাপেক্ষা ভ
আমাদের স্বজাতিকে—যাহার হিতের জন্য প্রাণ পণ করা যাইবে,
সে-ই আমাদের প্রধান বিপদের কারণ, আমরা যাহার সহায়তা
করিতে যাইব তাহার নিকট হইতে সহায়তা পাইব না, কাপুরুষগণ
সত্য অস্বীকার করিবে, নিপীড়িতগণ আপন পীড়া গোপন করিয়
যাইবে, আইন আপন বজ্রমুষ্টি প্রসারিত করিবে এবং জেলখানা
আপন লৌহবদন ব্যাদান করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে
আসিবে কিন্তু তথাপি অকৃত্রিম মহত্ব এবং স্বাভাবিক ন্যায়পরতা
বশতঃ আমাদের মধ্যে দুই চারিজন লোকও যখন শেষ পর্য্য
অটল থাকিতে পারিবে তখন আমাদের জাতীয় বন্ধনের সূত্রপাত
হইতে থাকিবে এবং তখন আমরা ন্যায় বিচার পাইবার অধিকার
প্রাপ্ত হইব।

জানি না, হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ অথবা ভারতবর্ষীয় ও ইংরাজের সংঘর্ষস্থলে আমরা যাহা অনুমান ও অনুভব করিয়া থাকি তাহা সত্য কি না, আমরা যে অবিচারের আশঙ্কা করিয়া থাকি, তাহা সমূলক কি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানি যে, কেবল মাত্র বিচারকের অনুগ্রহ ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির উপর বিচারভার রাখিয়া দিলে সুবিচারের অধিকারী হওয়া যায় না। রাজতন্ত্র যতই উন্নত হোক, প্রজার অবস্থা নিতান্ত অবনত হইলে সে কখনই আপনাকে উচ্চে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না, কারণ মানুষের দ্বারাই রাজ্য চালিয়া থাকে, যন্ত্রের দ্বারাও নহে, দেবতার দ্বারাও নহে। তাহাদের নিকট যখন আমরা আপনাদিগকে মনুষ্য বলিয়া প্রমাণ দিব তখন তাহারা সকল সময়েই আমাদের সহিত মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিবে। যখন ভারতবর্ষে অন্ততঃ কতকগুলি লোকও উঠিবেন যাঁহারা আমাদের মধ্যে অটল সত্যপ্রিয়তা ও নির্ভীক ন্যায়পরতার উন্নত আদর্শ স্থাপন করিবেন, যখন ইংরেজ অন্তরের সহিত অনুভব করিবে যে, ভারতবর্ষ ন্যায় বিচার নিশ্চেষ্ট ভাবে গ্রহণ করে না, সচেষ্ট ভাবে প্রার্থনা করে, অন্যায় নিবারণের জন্য প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয় তখন তাহারা কখনও ভ্রমেও আমাদিগকে অবহেলা করিবে না এবং আমাদের প্রতি ন্যায় বিচারে শৈথিল্য করিতে তাহাদের স্বভাবতই প্রবৃত্তি হইবে না।" (সাধনা, ১৩০১)

এই ঐক্যসাধনের পথে ভারতবর্ষের বিচিত্রতাকে দেখে ভয় করবার কিছুই নেই। এই বিচিত্রতার মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষ যুগে যুগে ঐক্যের মন্ত্র ঘোষণা করেচে ও সবাইকে আপনার ক'রে নিয়েচে।

যখনি বৈচিত্র্যের বাহির বা খোসা নিয়ে নাড়াচাড়া করা যায় বাহিরকেই কেবল বড় ক'রে দেখা যায়, তখনি বৈচিত্র্য ভিন্নতা পর্য্যবসিত হ'য়ে যায় ও মনে মনে ভেদের সৃষ্টি ক'রে দেয়। কি ভারতের সাধনা বাহিরের নয়, অন্তরের মাহাত্ম্য দিয়ে সে পর সকল অবস্থায় আপনার ক'রে নিয়েচে। যেখান হ'তে আমরা এ মহাঐক্যের মন্ত্র পেয়েচি, হাজার হাজার বছর ধ'রেও আমরা যেখা ম'রে ম'রে বেঁচে উঠেচি, সেই যে বিরাট মা আমাদের বুকে নি রক্ষার প্রেরণা জাগিয়ে দিচ্ছেন, তাঁকে সবাই আমরা যদি এক যো বুঝ্‌তে পারি তবেই ভ্রাতৃত্বের মহাঐক্যবন্ধন সহজ হ'য়ে ওঠে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ভাবউচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তাই সমস্ত ভারতবাসী ডেকে বলেছিলেন—

"আমাদের বুদ্ধি, আমাদের হৃদয়, আমাদের রুচি যে প্রতিদিন জলে দরে বিকাইতেছে, তাহা প্রতিরোধ করিবার একমাত্র উপায়- আমরা নিজে যাহা, তাহা সজ্ঞানভাবে, সবলভাবে, সচলভা সম্পূর্ণভাবে হইয়া উঠা।

আমাদের যে শক্তি আবদ্ধ আছে, তাহা বিদেশ হই বিরোধের আঘাত পাইয়াই মুক্ত হইবে। কারণ আজ পৃথিবী তাহার কাজ আসিয়াছে। আমাদের দেশে তাপসেরা তপ দ্বারা যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা মহামূল্য, বিধা তাহাকে নিষ্ফল করিবেন না। সেই জন্য উপযুক্ত সময়েই তি নিশ্চেষ্ট ভারতকে সুকঠিন পীড়নের দ্বারা জাগ্রত করিয়াছেন।

বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরো

বলিয়া জানে না, সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এই জন্যই ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া, একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এই জন্য সকল পন্থাকেই সে স্বীকার করে, স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়।

ভারতবর্ষের এই গুণ থাকাতে, কোন সমাজকে আমাদের বিরোধী কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইব না। প্রত্যেক নব নব সংঘাতে আমরা আমাদের বিস্তারেরই প্রত্যাশা করিব। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না—এই খানে তাহারা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। এই সামঞ্জস্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যতই দেশ বিদেশের হৌক, তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের।

আমরা ভারতবর্ষের বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট এই নিয়োগটি যদি স্মরণ করি, তবে আমাদের লক্ষ্য স্থির হইবে, লজ্জা দূর হইবে, ভারতবর্ষের মধ্যে যে একটি মৃত্যুহীন শক্তি আছে, তাহার সন্ধান পাইব। আমাদিগকে ইহা মনে রাখিতেই হইবে যে, য়ুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানকে যে চিরকালই আমরা শুদ্ধমাত্র ছাত্রের মতো গ্রহণ করিব, তাহা নহে,—ভারতবর্ষের সরস্বতী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত দল ও দলাদলিকে একটি শতদল পদ্মের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবেন—তাহাদের খণ্ডতা দূর করিবেন। ঐক্য সাধনাই ভারত-বর্ষীয় প্রতিভার প্রধান কাজ। ভারতবর্ষ কাহাকেও ত্যাগ করিবার, কাহাকেও দূরে রাখিবার পক্ষে নহে,—ভারতবর্ষ সকলকেই স্বীকার করিবার, গ্রহণ করিবার, বিরাট একের মধ্যে সকলকেই স্ব স্ব প্রাচীন প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করিবার পন্থা। এই বিবাদ-

নিরত ব্যবধানসঙ্কুল পৃথিবীর সম্মুখে একদিন নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

সেই মহৎ দিন আসিবার পূর্ব্বে—'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক!' যে মা দেশের প্রত্যেককে কাছে টানিবার, অনৈক্য ঘুচাইবার, রক্ষা করিবার জন্য নিয়ত ব্যাপৃত রহিয়াছেন, যিনি আপন ভাণ্ডারের চির-সঞ্চিত জ্ঞান-ধর্ম্ম নানা আকারে নানা উপলক্ষ্যে আমাদের প্রত্যেকের অন্তঃকরণের মধ্যে অশ্রান্ত ভাবে সঞ্চার করিয়া আমাদের চিত্তকে সুদীর্ঘ পরাধীনতার নিশীথরাত্রে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন—দেশের মধ্যস্থলে সন্তান-পরিবৃত যজ্ঞশালায় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করো! আমাদের দেশ তো একদিন ধনকে তুচ্ছ করিতে জানিত, একদিন দারিদ্র্যকে শোভন ও মহিমান্বিত করিতে শিখিয়াছিল—আজ আমরা কি টাকার কাছে সাষ্টাঙ্গে ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া আমাদের সনাতন স্বধর্ম্মকে অপমানিত করিব? আজ আবার আমরা সেই শুচিশুদ্ধ সো মিত সংযম, সেই সল্পোপকরণ গ্রহণ করিয়া আমাদের তপস্বিনী জননীর সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিব না? একদিন যাহা আমাদের পক্ষে নিতান্তই সঙ্গত ছিল, তাহা কি আমাদের পক্ষে আ একেবারেই অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে?—কখনই নহে! নিরতিশয় দুঃসময়েও ভারতবর্ষের নিঃশব্দ প্রকাণ্ড প্রভাব ধীর ভাবে, নিগূঢ় ভাবে আপনাকে জয়ী করিয়া তুলিতেছে। আমি নিশ্চয় জানি ভারতবর্ষে সুগম্ভীর আহ্বান প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের বক্ষকুহরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে; এবং আমরা নিজের অলক্ষ্যে শনৈঃ শনৈঃ সেই ভারতবর্ষের দিকেই চলিয়াছি। আর যেখানে পথ আমাদের মঙ্গলদীপোজ্জ্বল গৃহের দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেইখা

আমাদের গৃহযাত্রার অভিমুখে দাঁড়াইয়া "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক!" (বঙ্গদর্শন—১৩১১)

ঐক্যের পথে চল্‌তে আমাদিগকে আর একটি বিষয়ে অবহিত হতে হবে। বিরুদ্ধ শক্তি আমাদের ঐক্য ভেঙে দেবার চেষ্টা করবে বা ভেঙে দিবে। কিন্তু তবু সঙ্গে সঙ্গে তা' গ'ড়ে তোল্‌বার জন্যে আমাদিগকে কতকগুলি গুণ অর্জ্জন করতে হবে। পরকে ছোট কর্‌বার, অমান্য কর্‌বার কিম্বা ক্ষমাহীন বিরোধিতা ক'রে প্রতিশোধ নেবার মনোবৃত্তি একেবারে ভুলে গিয়ে পরের উন্নতি চেষ্টা, বিনয় প্রদর্শন, উগ্রতা পরিহার করা ও ঐক্যের জন্যে অযোগ্যের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করাও অভ্যাস করতে হবে। এভাবে যখন ঐক্যের সৃষ্টি ক'রে মহৎ কর্ত্তৃত্বের অধিকার লাভ করা যাবে তখন আমাদের এই অভ্যস্ত সদ্‌গুণের মহিমাই আমাদিগকে বড় ক'রে তুলবে। ঐক্য সাধনার পথে রবীন্দ্রনাথের প্রধান মন্ত্র এই—

"যখন দেখা যাইতেছে বাহির হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা নিয়ত সতর্ক রহিয়াছে তখন তাহার প্রতিকারের জন্য নানারূপে কেবলি দল বাঁধিবার দিকে আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে নিযুক্ত করিতে হইবে।

যে গুণ মানুষকে একত্র করে তাহার মধ্যে একটা প্রধান গুণ বাধ্যতা। কেবলি অন্যকে খাটো করিবার চেষ্টা, তাহার ত্রুটি ধরা, নিজেকে কাহারো চেয়ে ন্যূন মনে না করা, নিজের একটা মত অনাদৃত হইলেই অথবা নিজের একটুখানি সুবিধার ব্যাঘাত হইলেই দল ছাড়িয়া আসিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার

প্রয়াস—এইগুলিই সেই সয়তানের প্রদত্ত বিষ, যাহা মানুষকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেয়, যজ্ঞ নষ্ট করে। ঐক্য রক্ষার জন্য আমাদিগকে অযোগ্যের কর্ত্তৃত্বও স্বীকার করিতে হইবে—ইহাতে মহান্ সঙ্কল্পের নিকট নত হওয়া হয়, অযোগ্যতার নিকট নহে। বাঙালীকে ক্ষুদ্র আত্মাভিমান দমন করিয়া নানারূপে বাধ্যতার চর্চ্চা করিতে হইবে,—নিজে প্রধান হইবার চেষ্টা মন হইতে সম্পূর্ণ রূপে দূর করিয়া অন্যকে প্রধান করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সর্ব্বদাই অন্যকে সন্দেহ করিয়া অবিশ্বাস করিয়া, উপহাস করিয়া তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় না দিয়া বরঞ্চ নম্রভাবে বিনা বাক্যব্যয়ে ঠকিবার জন্যও প্রস্তুত হইতে হইবে। সম্প্রতি এই কঠিন সাধনা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে—আপনাকে খর্ব্ব করিয়া আপনাদিগকে বড় করিবার এই সাধনা, গর্ব্বকে বিসর্জ্জন দিয়া গৌরবকে আশ্রয় করিবার এই সাধনা,—ইহা যখন আমাদের সিদ্ধ হইবে, তখন আমরা সর্ব্ব প্রকার কর্ত্তৃত্বের যথার্থরূপে যোগ্য হইব। ইহা নিশ্চিত, যথার্থ যোগ্যতাকে পৃথিবীতে কোন শক্তিই প্রতিরোধ করিতে পারে না। আমরা যখন কর্ত্তৃত্বের ক্ষমতা লাভ করিব, তখন আমরা দাসত্ব করিব না—তাহা আমাদের প্রভু যত বড়ই প্রবল হউন। জল যখন জমিয়া কঠিন হয়, তখন সে লোহার পাইপকেও ফাটাইয়া ফেলে। আজ আমরা জলের মত তরল আছি, যন্ত্রীর ইচ্ছামত যন্ত্রের তাড়নায় লোহার কলের মধ্যে শত শত শাখা প্রশাখায় ধাবিত হইতেছি—জমাট বাঁধিবার শক্তি জন্মিলেই লোহার বাঁধকে হার মানিতে হইবে।

(বঙ্গদর্শন, ১৩১২—আশ্বিন)

এই ঐক্য সাধনার মন্ত্র হ'তেই মানুষের প্রতি মানুষের একটি শ্রদ্ধার সঞ্চার হবে। তখন আর কেউ কাকে হীন চোখে দেখ্‌তে চাইবে না। প্রত্যেকের কাছে প্রত্যেকের সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকবে। ব্যবহারে, বাক্যে, চিন্তায় কারো কাছে কারো সম্মান নষ্ট হবে না। তখনি জাতি সভ্যতার উন্নত স্তরে গিয়ে পৌঁছাবে। আর যদি তা না ক'রে নিজের মতপ্রাধান্য বজায় রাখ্‌বার জন্যে অপরের মনের উপর জোর জুলুম ক'রে নিজের দল বাঁধবার চেষ্টা করা যায় তবে দল হয়ত বা হতেও পারে কিন্তু কতকগুলি দুর্ব্বল বশীভূত মন নিয়ে তা' হবে। তারা অন্তরে অন্তরে প্রত্যেকেই পরাধীন। সেই পরাধীনের দল স্বাধীনতার সত্যিকার মাহাত্ম্য বুঝ্‌তেও পার্‌বে না কেউ তাদেরে স্বাধীনতার মর্য্যাদাও দিবে না। পরকে আপন কর্‌তে হ'লে—স্বাধীনতার জন্যে আপন কর্‌তে হ'লে, পরের উপকারের জন্যে নিজকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ ক'রে দিতে হবে, নিজেকে সেবকের কর্ত্তব্য বহন ক'রে নিতে হবে। পরকে অনুগত কর্‌বার ইচ্ছাই তাকে ছোট কর্‌বার পথ তৈরী করে দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"যদি মানুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকে তবে লোকের ঘরে আগুন লাগানো এবং মারধোর করিয়া গুণ্ডামি করিতে আমাদের কদাচই প্রবৃত্তি হইবে না; তবে আমরা পরম ধৈর্য্যের সহিত মানুষের বুদ্ধিকে, হৃদয়কে, মানুষের ইচ্ছাকে মঙ্গলের দিকে ধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ করিতে প্রাণপাত করিতে পারিব। তখন আমরা মানুষকেই চাহিব, মানুষ কী কাপড় পরিবে বা কী নুন খাইবে তাহাই সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া চাইব না। মানুষকে চাহিলে মানুষের সেবা করিতে হয়। মানুষকে যদি চাই তবে যথার্থভাবে

মানুষের সাধনা করিতে হইবে; তাহাকে কোনো মতে আমার মতে ভিড়াইবার, আমার দলে টানিবার জন্য টানাটানি মারামারি না করিয়া আমাকে তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। সে যখন বুঝিবে আমি তাহাকে আমার অনুবর্ত্তী অধীন করিবার জন্য বল পূর্ব্বক চেষ্টা করিতেছি না—আমি নিজেকে তাহারই মঙ্গল সাধনের জন্য উৎসর্গ করিয়াছি, তখনি সে বুঝিবে আমি মানুষের সঙ্গে মনুষ্যোচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি—তখনি সে বুঝিবে—বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের দ্বারা আমরা সেই মাকে বন্দনা করিতেছি। দেশের ছোট-বড় সকলেই তাঁহার সন্তান। তখন মুসলমানই কি আর নমশূদ্রই কি, বেহারী উড়িয়া অথবা অন্য যে-কোন ইংরাজি শিক্ষায় পশ্চাদ্বর্ত্তী জাতিই কি, নিজের শ্রেষ্ঠতার অভিমান লইয়া কাহাকেও ব্যবহারে বা বাক্যে বা চিন্তায় অপমানিত করিব না। তখনি সকল মানুষের সেবা ও সম্মানের দ্বারা, যিনি সকল প্রজার প্রজাপতি, তাঁহার প্রসন্নতা এই ভাগ্যহীন দেশের প্রতি আকর্ষণ করিতে পারিব। নতুবা আমার রাগ হইয়াছে বলিয়াই দেশের সকল লোককে আমি রাগাইয়া তুলিব, অথবা আমি ইচ্ছা করিতেছি বলিয়া দেশের সকল লোকের ইচ্ছাকে আমার অনুগত করিব ইহা কোন বাগ্মিতার দ্বারা কদাচ ঘটিবে না। ক্ষণকালের জন্য একটা উৎসাহের উত্তাপ জাগাইয়া তুলিতে পারি কিন্তু তাহা সত্যকার ইন্ধনের অভাবে কখনই স্থায়ী হইতে পারিবে না। সেই সত্য পদার্থ মানুষ—সেই সত্য পদার্থ মানুষের হৃদয়বুদ্ধি, মানুষের মনুষ্যত্ব, স্বদেশী মিলের কাপড় অথবা করকচ লবণ নহে। সেই মানুষকে প্রত্যহ অপমানিত করিয়া মিলের কাপড়ের পূজা করিতে থাকিলে

আমরা দেবতার বর পাইব না। বরঞ্চ উল্টা ফলই পাইতে থাকিব।"

(সমূহ, ১৪১৫০)

নানা অসামঞ্জস্য যখন জাতির মধ্যে ভীষণ রূপে জড় পাকাতে থাকে তখনই আসে একটা পরিবর্ত্তনের কাল। তখন ভাঙন গড়নের একটা প্রকাণ্ড হৈ চৈ লেগে যায়। কিন্তু এ সময়েই মানুষকে খুব বেশী রকম শক্ত, সংযমী, বিবেকী ও শক্তিমান্ হয়ে কর্ত্তব্যের দৃঢ় যন্ত্র হাতে নিয়ে দাঁড়াতে হয়। এভাবে জাতির পরিবর্ত্তনের প্রথম উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই ভাঙনের আঘাতই খুব বড় হয়ে দেখা দেয়। বহুদিনের বিক্ষুব্ধ মন তখন দিক্ বিদিক্ ভুলে শুধু চায়—মরুক আর বাঁচুক সে—সমস্ত ধ্বংস ক'রে দিতে। কিন্তু তখন যে দুর্ব্বলের গঠনের শক্তি কম থাকে, সে ঐ চাপে নির্ম্মূল হয়ে যায়। আর যার পিছনে গঠনশক্তি জোরাল থাকে সে উত্‌রে যায়। এই জন্যে গঠনের কঠোর সাধনাই মন দিয়ে করতে হবে। ভাঙনের জন্যে চেষ্টার দরকার হয় না, কালের প্রবাহই নিজে বহন ক'রে তাকে নিয়ে আসে। ভাঙনের অবিবেচক উত্তেজনার অতিরিক্ত আঘাত গঠনের শক্তিকে খুব শোচনীয় ভাবে নষ্ট ক'রে দেয়। তাই রবীন্দ্রনাথ গঠনে সাধক ও ভাঙনে বিবেচক হবার মঙ্গলপথ দেখিয়ে বলেচেন—

"সকল দেশের ইতিহাসেই কোন বৃহৎ ঘটনা যখন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া দেখা দেয় তখন তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমরা একটা প্রবল আঘাত ও আন্দোলন দেখিতে পাই। রাষ্ট্রে বা সমাজে অসামঞ্জস্যের বোঝা অনেকদিন হইতে নিঃশব্দে পুঞ্জীভূত হইতে হইতে একদিন একটা আঘাতে হঠাৎ তাহা বিপ্লবে ভাঙিয়া পড়ে।

সেই সময় দেশের মধ্যে যদি অনুকূল উপকরণ প্রস্তুত থাকে, পূর্ব্ব হইতেই যদি তাহার ভাণ্ডারে নিগূঢ় ভাবে জ্ঞান ও শক্তির সম্বল সঞ্চিত থাকে তবেই সেই বিপ্লবের দারুণ আঘাতকে কাটাইয়া সে দেশ আপনার নূতন জীবনকে নবীন সামঞ্জস্য দান করিয়া গড়িয়া তোলে। দেশের সেই আভ্যন্তরিক প্রাণসম্বল যাহা অন্তঃপুরের ভাণ্ডারে প্রচ্ছন্নভাবে উপচিত হয় তাহা আমরা দেখিতে পাই না বলিয়া আমরা মনে করি বুঝি বিপ্লবের দ্বারাতেই দেশ স্বার্থকতা লাভ করিল,—বিপ্লবই যেন মঙ্গলের মূল কারণ এবং মুখ্য উপায়।

ইতিহাসকে এইরূপে বহুভাবে দেখিয়া একথা ভুলিলে চলিবে না যে, দেশের মর্ম্মস্থানে সৃষ্টি করিবার শক্তি ক্ষীণ হইয়াছে, প্রলয়ের আঘাতকে সে কখনই কাটাইয়া উঠিতে পারে না। গড়িয়া তুলিবার বাঁধিয়া তুলিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাহাদের মধ্যে সজীবভাবে বিদ্যমান, ভাঙনের আঘাত তাহাদের সেই জীবন-ধর্ম্মকেই তাহাদের সৃজনী শক্তিকেই সচেষ্ট সচেতন করিয়া তোলে। এইরূপে সৃষ্টিকেই নূতন বলে উত্তেজিত করে বলিয়াই প্রলয়ের গৌরব। নতুবা শুদ্ধমাত্র ভাঙন, নির্ব্বিচার বিপ্লব, কোন মতেই কল্যাণকর হইতে পারে না।" (বঙ্গদর্শন, ১৩১৫)

সমগ্রদেশের লোকের মধ্যে যদি ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি সৃষ্টি করে দেওয়া যায় তা হ'লে একটা ঐক্যসমাধান হতে পারে এরূপ অনেক উত্তেজনাপ্রিয় দেশভক্তের অভিমত, কিন্তু তাঁরা একবার ভেবে দেখেন না যে, এই বিদ্বেষবুদ্ধির অনুশীলনে যে বিরাট জাতি একটি হীন বৃত্তিতে জীবনকে কলুষিত ক'রে রইল এর পরিণতি কোথায়? যদি ইংরেজ এদেশ ছেড়ে চ'লে যায় তবে তাহাদের এই মনোবৃত্তির

জঘন্য অস্ত্র কোথায় নিক্ষেপ করবে? তখন কি তারা নিজেদের বিদ্বেষের অস্ত্রে ঐক্যের বাঁধন ছেদন করবে না! মহৎ কর্ম্ম করতে হ'লে কুমৎলবে কখনো হবে না। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের সাধনায় মহত্তর আধ্যাত্মিক শক্তিসঞ্চারের বাণী ছাড়া আর কোন বাণী নেই। আমরা যদি পদে পদে ইংরেজকে ঘৃণা ক'রে—ইংরাজকে তাড়াবার জন্যে তাদেরই মন্ত্র অন্তরে অন্তরে যপ্‌তে থাকি, ভারতবর্ষের নীতি ধর্ম্মকেও ভুলে গিয়ে কেবল পাশ্চাত্যের অপদেবতাকে গোপন অন্তরে স্থান দিয়ে খুব জোর গলায় স্বদেশীর বড়াই করতে থাকি তবে কি আমাদের দুর্গতি ঘুচ্‌বে? বাইরে বাইরে বিদেশীর সভ্যতা, আচার, নীতি ও শিক্ষাদীক্ষা অসহ্য ব'লে তাকে ঠেল্‌তে গিয়ে যদি অন্তরে নির্ব্বোধের মত তার অনুশীলন করি তবে এ জাতির মরণ ছাড়া গত্যন্তর কোথায়? রবীন্দ্রনাথ জাতীয় জীবনের এবম্বিধ বিদ্বেষবুদ্ধি ও উগ্রতার প্রতি করুণভাবে কঠোর ইঙ্গিত প্রদর্শন ক'রে বলেচেন—

"শুনিয়াছি এমন কথাও কেহ কেহ বলেন যে, ইংরাজের প্রতি দেশের সর্ব্বসাধারণের বিদ্বেষই আমাদিগকে ঐক্যদান করিবে। প্রাচ্য পরজাতীয়ের প্রতি স্বাভাবিক নির্ম্মমতায় ইংরেজ ঔদাসীন্যে ও ঔদ্ধত্যে ভারতবর্ষের ছোট-বড় সকলকেই ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে। যত দিন যাইতেছে এই বেদনার তপ্ত শেল গভীর ও গভীরতর রূপে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে অনুবিদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। এই নিত্যবিস্তারপ্রাপ্ত বেদনার ঐক্যেই ভারতের নানা জাতি মিলিবার উপক্রম করিতেছে। অতএব বিদ্বেষকেই আমাদের প্রধান আশ্রয়রূপে অবলম্বন করিতে হইবে। এ কথা যদি সত্যই হয় তবে বিদ্বেষের কারণটি যখন চলিয়া

যাইবে, ইংরেজ যখনই এ দেশ ত্যাগ করিবে, তখনি কৃত্রিম ঐক্যসূত্রটি ত এক মুহূর্ত্তে ছিন্ন হইয়া যাইবে। তখন দ্বিতীয় বিদ্বেষের বিষয় আমরা কোথায় খুঁজিয়া পাইব? তখন আর দূরে খুঁজিতে হইবে না, বাহিরে যাইতে হইবে না, রক্তপিপাসু বিদ্বেষ-বুদ্ধির দ্বারা আমরা পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে থাকিব।"

(ভারতী, ১৩:৫)

* * *

"ঐ যে বন্দীশালায় লৌহশৃঙ্খলের কঠোর ঝঙ্কার শুনা যাইতেছে—দণ্ডধারী পুরুষদের পদশব্দে কম্পমান রাজপথ মুখরিত হইয়া উঠিতেছে ইহাকেই অত্যন্ত বড় করিয়া জানিয়ো না। যদি কান পাতিয়া শোন তবে কালের মহা সঙ্গীতের মধ্যে ইহা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। কত যুগ হইতে কত বিপ্লবের আবর্ত্তে, কত উৎপীড়নের মন্থন এদেশের সিংহদ্বারে কত বড় বড় রাজ-প্রতাপের প্রবেশ ও প্রস্থানের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের পরিপূর্ণতা অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে, অদ্যকার ক্ষুদ্র দিন তাহার যে ক্ষুদ্র ইতিহাসটুকু ইহার সহিত মিলিত করিতেছে আর কিছুকাল পরে সমগ্রের মধ্যে তাহা কি কোথাও দৃষ্টিগোচর হইবে? ভয় করিব না, ক্ষুব্ধ হইব না, ভারতবর্ষের যে পরম মহিমা সমস্ত কঠোর দুঃখ সংঘাতের মধ্যে বিশ্বকবির সৃজনানন্দকে বহন করিয়া ব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে—ভক্ত সাধকের প্রশান্ত ধ্যাননেত্রে তাহার অখণ্ড মূর্ত্তি উপলব্ধি করিব। চারিদিকের কোলাহল ও চিত্তবিক্ষেপের মধ্যে সাধনাকে মহৎ লক্ষ্যের দিকে অবিচলিত রাখিব। নিশ্চয় জানিব এই ভারতবর্ষে যুগযুগান্তরীয় মানবচিত্তের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা বেগ

মিলিত হইয়াছে—এইখানেই জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের মন্থন হইবে, জাতির সহিত জাতির মিলন ঘটিবে। বৈচিত্র্য এখানে অত্যন্ত জটিল, বিচ্ছেদ এখানে অত্যন্ত প্রবল, বিপরীতের সমাবেশ এখানে অত্যন্ত বিরোধসঙ্কুল—এত বহুত্ব, এত বেদনা, এত সংঘাত কোন দেশই এত দীর্ঘ কাল বহন করিয়া বাঁচিতে পারিত না—কিন্তু একটি অতি বৃহৎ অতি মহৎ সমন্বয়ের পরম অভিপ্রায়ই এই সমস্ত একান্ত বিরুদ্ধতাকে ধারণ করিয়া আছে, পরস্পরের আঘাতে কাহাকেও উৎসাদিত হইতে দেয় নাই। এই যে সমস্ত নানা বিচিত্র উপকরণ কাল কালান্তর দেশ দেশান্তর হইতে এখানে আহরিত হইয়াছে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিদ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে গেলে আমরা নিজেই আহত হইব, তাহার কিছুই করিতে পারিব না। জানি বাহির হইতে অন্যায় এবং অপমান আমাদের এমন প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিতেছে, যাহা আঘাত করিতেই জানে, যাহা ধৈর্য্য মানে না, যাহা বিনাশ স্বীকার করিয়াও নিজের চরিতার্থতাকেই সার্থকতা বলিয়া জ্ঞান করে। কিন্তু সেই আত্মাভিমানের প্রমত্ততাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য আমাদের অন্তকরণের মধ্যে সুগভীর আত্মগৌরব সঞ্চার করিবার অন্তরতর শক্তি কি ভারতবর্ষ আমাদিগকে দান করিবেন না? যাহারা নিকটে আসিয়া আমাদের পরিচয় গ্রহণ করিতে ঘৃণা করে, যাহারা দূর হইতে আমাদের প্রতি বিদ্বেষ উদ্গার করে সেই সকল ক্ষণকালীন বায়ু দ্বারা স্ফীত সংবাদপত্রের মর্ম্মরধ্বনি —সেই বিলাতের টাইম্‌স্ অথবা এই দেশের টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়ার বিদ্বেষ তীক্ষ্ণ বাণীই কি অঙ্কুশ আঘাতের মত আমাদিগকে বিরোধের পথে অন্ধবেগে চালনা করিবে? আর ইহা অপেক্ষা

সত্যতর নিত্যতর বাণী আমাদের পিতামহদের পবিত্রতর মুখ দিয়া কি এদেশে উচ্চারিত হয় নাই? যে বাণী দূরকে নিকট করিতে বলে, পরকে আত্মীয় করিতে আহ্বান করে, সেই সকল শান্তিগম্ভীর সনাতন কল্যাণবাক্যই আজ পরাস্ত হইবে? ভারতবর্ষে আমরা মিলিব এবং মিলাইব, আমরা সেই দুঃসাধ্য সাধনা করিব, যাহাতে শত্রু-মিত্র ভেদ লুপ্ত হইয়া যায়; যাহা সকলের চেয়ে উচ্চ সত্য, যাহা পবিত্রতার তেজে ক্ষমার বীর্য্যে প্রেমের অপরাজিত শক্তিতে পূর্ণ, আমরা তাহাকে কখনই অসাধ্য বলিয়া জানিব না, তাহাকে নিশ্চিত মঙ্গল জানিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লইব। দুঃখ বেদনার একান্ত পীড়নের মধ্য দিয়া যাত্রা করিয়া আজ উদার আনন্দে মন হইতে সমস্ত বিদ্রোহ-ভাব দূর করিয়া দিব, জানিয়া না জানিয়া বিশ্বের মানব এই ভারত ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের যে পরমাশ্চর্য্য মন্দির নানা ধর্ম্ম নানা শাস্ত্র নানা জাতির সম্মিলনে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে সেই সাধনাতেই যোগদান করিব, নিজের অন্তরের সমস্ত শক্তিকে একমাত্র সৃষ্টি-শক্তিতে পরিণত করিয়া এই রচনাকার্য্যে তাহাকে প্রবৃত্ত করিব। তাহা যদি করিতে পারি, যদি জ্ঞানে প্রেমে ও কর্ম্মে ভারতবর্ষের এই অভিপ্রায়ের মধ্যে সমস্ত প্রাণ দিয়া নিযুক্ত হইতে পারি তবেই মোহমুক্ত পবিত্র দৃষ্টিতে স্বদেশের ইতিহাসের মধ্যে সেই এক সত্য সেই নিত্য সত্যকে দেখিতে পাইব।” (ভারতী, ১৩১৫)

দেশের মধ্যে বিপ্লবের একটি ধারা বয়ে চলেচে। ইহার অনেকটা যে পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকেই আমদানী তা' বললে অত্যুক্তি হয় না। যখনি এসম্বন্ধে কিছু কথা ওঠে তখনি বিপ্লবপ্রিয় দলের অনেকেই

বলে ওঠেন,—ইতিহাস যে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে ও যে নীতির সাক্ষ্য দিচ্ছে তাকে অস্বীকার করলে চল্‌বে না। স্বাধীনতা লাভ করবার জন্যে এ পথ ছাড়া নান্য পন্থা বিদ্যতে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এসম্বন্ধে সুন্দর যুক্তি দেখিয়ে বলেচেন, যত জাতি স্বাধীন হয়ে উঠেচে, সকলের স্বাধীনতা লাভ করাই যে কেবল বড় উদ্দেশ্য ছিল এমন নহে, তাহা রক্ষা করবার যোগ্যতাও তাদের মধ্যে ছিল এবং সেই যোগ্যতা অর্জ্জন কর্‌বার জন্যে সকল জাতির মধ্যেই দীর্ঘকালের কঠোর তপস্যা চলেছিল। কিন্তু আমাদের মধ্যে পরাধীনতার জ্বালাই প্রখর হয়ে এখন সবে মাত্র দেখা দিয়েচে কিন্তু একে পেতে হলে এর রক্ষার গুণগুলি ও অধিকারীত্বের মহত্বসকল অর্জ্জন করতে হবে। প্রথমেই চিত্তবিক্ষোভের মধ্য হতে ধৈর্য্যহারিয়ে ক্রুদ্ধ আবেগে যদি অনর্থের চিন্তাই কেবল করি তবে আমাদের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। শক্তির অনুভূতি হবার আগে শক্তির অভিমান মনে জাগ্‌লে শক্তিহীনতাই সঙ্গের সাথী হয়। দীর্ঘকাল ধ'রে দেশের হিতানুষ্ঠানের জন্যে নিজেকে সেবাকার্য্যে উচ্চসঙ্কল্পসাধনার পথে যদি ধৈর্য্য সহকারে নিয়োগ কর্‌তে না পারা যায় তবে নিজের প্রকৃতি স্বাধীনতার জন্যে গ'ড়ে ওঠে না। চিরদিন সঙ্কীর্ণ জীবন যাপন ক'রে একদিন হঠাৎ রাগের মাথায় দেশের বড় কাজ কর্‌বার চেষ্টা নিষ্ফলতাকেই টেনে আনে। অতএব স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে হ'লে, ক্রোধ-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে স্থিরবুদ্ধিতে সত্যপথে শিক্ষিত মন গঠনের জন্যে দীর্ঘ তপস্যায় নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে। যখন শক্তি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়বে তখন বিদ্বেষবিহীন পরিমিত উত্তেজনার দরকার হয় তো বা হবে—নিজেকে সচেষ্ট ক'রে তোলবার জন্যে শুধু।

"অত্যন্ত চিত্তক্ষোভের সময়েই ইতিহাসকে আমরা ভুল করিয়া পড়ি। মনে স্থির করি, যে সকল অধীন দেশ স্বাধীন হইয়াছে তাহারা বিপ্লব করিয়াছে বলিয়াই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে; এই স্বাধীনতাকে হাতে পাওয়া এবং হাতে রাখার জন্য আর কোন গুণ থাকা আবশ্যক কি না তাহা আমরা স্পষ্ট করিয়া ভাবিতেই চাহি না, অথবা তাড়াতাড়ি করিয়া মনে করি, সে সমস্তগুণ আমাদের আছে কিম্বা উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে সেগুলি আপনই কোন রকম করিয়া জোগাইয়া যাইবে।

এইরূপে মানুষের চিত্ত যখন অপমানে আহত হইয়া নিজের গৌরব সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, কঠিন বাধাকে উন্মত্তের মত একেবারে অস্বীকার করিয়া অসাধ্য চেষ্টায় আত্মহত্যা করিবার উদ্যোগ করিতেছে, তাহার মত মর্ম্মান্তিক, করুণাবহ ব্যাপার জগতে আর কি আছে! এই প্রকার দুশ্চেষ্টা অনিবার্য্য ব্যথার মধ্যে লইয়া যাইবেই, তথাপি ইহাকে আমরা পরিহার করিতে পারিব না। ইহার মধ্যে মানব-প্রকৃতির, যে পরম দুঃখকর অধ্যবসায় আছে তাহা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সর্ব্বকালেই নানা উপলক্ষ্যে নানা অসম্ভব প্রত্যাশায় অসাধ্য সাধনে বারম্বার দগ্ধপক্ষ পতঙ্গের ন্যায় নিশ্চিত পরাভবের বহ্নিশিখায় অন্ধভাবে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে।

যাই হোক, যেমন করিয়াই হোক, শক্তির অভিমান আঘাত পাইয়া জাগিয়া উঠিলে সেটা জাতির পক্ষে যে অনিষ্টকর, তাহা বলা যায় না। তবে কিনা বিরোধের ক্রুদ্ধ আবেগের দ্বারা আমাদের এই উদ্যম আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেশের শক্তিকে বিরোধের মূর্ত্তিতেই প্রকাশ করিবার

দুর্ব্বুদ্ধি অন্তরে পোষণ করিতেছেন কিন্তু যাহারা সহজ অবস্থায় কোন দিন স্বাভাবিক অনুরাগের দ্বারা দেশের হিতানুষ্ঠানে ক্রমান্বয়ে অভ্যস্ত হয় নাই, যাহারা উচ্চ সংকল্পকে বহুদিনের ধৈর্য্যে নানা উপকরণে নানা বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিবার কাজে নিজের প্রকৃতিকে প্রস্তুত করে নাই, অনেক দিন ধরিয়া রাষ্ট্র চালনার বৃহৎ কার্য্যক্ষেত্র হইতে দুর্ভাগ্যক্রমে বঞ্চিত হইয়া যাহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের অনুসরণে সংকীর্ণভাবে জীবনের কাজ করিয়া আসিয়াছে তাহারা হঠাৎ বিষম রাগ করিয়া এক নিমেষে দেশের একটা মস্ত হিত করিয়া ফেলিবে ইহা কোন মতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। ঠাণ্ডার দিনে নৌকার কাছেও ঘেষিলাম না, তুফানের দিনে তাড়াতাড়ি হাল ধরিয়া অসামান্য মাঝি বলিয়া দেশে বিদেশে বাহবা লইব এইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার স্বপ্নে ঘটাই সম্ভব। অতএব আমাদিগকেও কাজ একেবারে এই গোড়ার দিক হইতেই সুরু করিতে হইবে। তাহাতে বিলম্ব হইতে পারে—বিপরীত উপায়ে আরো অনেক বেশী বিলম্ব হইবে। মানুষ বিস্তীর্ণ মঙ্গলকে সৃষ্টি করে তপস্যা দ্বারা। ক্রোধে বা কামে সেই তপস্যা ভঙ্গ করে, এবং তপস্যার ফলকেও এক মুহূর্ত্তে নষ্ট করিয়া দেয়। নিশ্চয়ই আমাদের দেশেও কল্যাণকর চেষ্টা নিভৃতে তপস্যা করিতেছে; দ্রুত ফললাভের লোভ তাহার নাই, সাময়িক আশাভঙ্গের ক্রোধকে সে সংযত করিয়াছে; এমন সময় আজ অকস্মাৎ ধৈর্য্যহীন উন্মত্ততা যজ্ঞক্ষেত্রে রক্তবৃষ্টি করিয়া তাহার বহুদুঃখসঞ্চিত তপস্যার ফলকে কলুষিত করিয়া নষ্ট করিবার উপক্রম করিতেছে।

ক্রোধের আবেগ তপস্যাকে বিশ্বাসই করে না; তাহাকে

নিশ্চেষ্টতা বলিয়া মনে করে, তাহাকে নিজের আশু উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রধান অন্তরায় বলিয়া ঘৃণা করে; উৎপাতের দ্বারা সেই তপঃ সাধনাকে চঞ্চল, সুতরাং নিষ্ফল করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া প্রবৃত্ত হয়। ফলকে পাকিতে দেওয়াকেই সে ঔদাসীন্য বলিয়া জ্ঞান করে, টান দিয়া ফলকে ছিঁড়িয়া লওয়াকেই সে একমাত্র পৌরুষ বলিয়া জানে; সে মনে করে যে, মালী প্রতিদিন গাছের তলায় জল সেচন করিতেছে গাছের ডালে উঠিবার সাহস নাই বলিয়াই তাহার এই দীনতা। এ অবস্থায় মালীর উপর তাহার রাগ হয়, জল দেওয়াকে সে ছোট কাজ মনে করে। উত্তেজিত অবস্থায় মানুষ উত্তেজনাকেই জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় সত্য বলিয়া জানে, যেখানে তাহার অভাব দেখে সেখানে সে কোন সার্থকতাই দেখিতে পায় না।

কিন্তু স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে শিখার যে প্রভেদ, উত্তেজনার সঙ্গে শক্তির সেই প্রভেদ। চকমকি ঠুকিয়া যে স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকে তাহাতে ঘরের অন্ধকার দূর হয় না। তাহার আয়োজন যেমন স্বল্প, তেমনি তাহার প্রয়োজনও সামান্য। প্রদীপের আয়োজন অনেক, তাহা আবার গড়িতে হয়, শলিতা পাকাইতে হয়, তাহার তেল জোগাইতে হয়। যখন যথাযথ মূল্য দিয়া কেনা হইয়াছে এবং পরিশ্রম করিয়া সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে তখনি প্রয়োজন হইলে স্ফুলিঙ্গ আপনাকে স্থায়ী শিখায় পরিণত করিয়া ঘরকে আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। যখন উপযুক্ত চেষ্টার দ্বারা সেই প্রদীপরচনার আয়োজন করিবার উদ্যম জাগিতেছে না, যখন শুদ্ধমাত্র ঘন ঘন চকমকি ঠোকার চাঞ্চল্য মাত্রেই সকলে আনন্দে অভিভূত হইয়া উঠিতেছি তখন সত্যের অনুরোধে স্বীকার

করিতেই হইবে এমন করিয়া কখনই ঘরে আলো জ্বলিবে না কিন্তু ঘরে আগুনলাগা অসম্ভব নহে। কিন্তু শক্তিকে সুলভ করিয়া তোলার চেষ্টায় মানুষ উত্তেজনার আশ্রয় অবলম্বন করে। একথা ভুলিয়া যায় যে, এই অস্বাভাবিক সুলভতা একদিকে মূল্য কমাইয়া আর এক দিক দিয়া এমন করিয়া কষিয়া মূল্য আদায় করিয়া লয় যে, গোড়াতেই তাহার দুর্মূল্যতা স্বীকার করিয়া লইলে তাহাকে অপেক্ষাকৃত শস্তায় পাওয়া যাইতে পারে।

আমাদের দেশেও যখন দেশের হিতসাধনবুদ্ধি নামক দুর্লভ মহামূল্য পদার্থ একটি আকস্মিক উত্তেজনায় আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে অভাবনীয় প্রচুর রূপে দেখা দিল তখন আমাদের মত দরিদ্র জাতিকে পরমানন্দে উৎফুল্ল করিয়া তুলিল। তখন এ কথা, আমাদের মনে করিতেও প্রবৃত্তি হয় নাই যে, ভাল জিনিষের এত সুলভতা স্বাভাবিক নহে। এই ব্যাপক পদার্থকে কাজের শাসনের মধ্যে বাঁধিয়া সংযত সংহত করিতে না পারিলে ইহার প্রকৃত সার্থকতাই থাকে না। রাস্তা ঘাটের লোক যুদ্ধ করিব বলিয়া মাতিয়া উঠিলেই তাহাদিগকে সৈন্য জ্ঞান করিয়া যদি সুলভে কাজ সারিবার আশ্বাসে উল্লাস করিতে থাকি তবে সত্যকার লড়াইয়ের বেলায় সমস্ত ধন প্রাণ দিয়াও এই হঠাৎ শস্তার সাংঘাতিক দায় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না।

আসল কথা, মাতাল যেমন নিজের এবং মণ্ডলীর মধ্যে নেশাকে কেবলি বাড়াইয়া চলিতেই চায় তেমনি উত্তেজনার মাদকতা আমরা সম্প্রতি যখন অনুভব করিলাম তখন কেবলি সেটাকে বাড়াইয়া তুলিবার জন্য আমাদের প্রবৃত্তি অসংযত হইয়া

উঠিল। অথচ এটা যে একটা নেশার তাড়না সেকথা স্বীকার না করিয়া আমরা বলিতে লাগিলাম গোড়ায় ভাবের উত্তেজনারই দরকার বেশী; সেটা রীতিমত পাকিয়া উঠিলে আপনি তাহা কাজের দিকে ধাবিত হয়—অতএব দিনরাত যাহারা কাজ কাজ করিয়া বিরক্ত করিতেছে তাহারা ছোটনজরের লোক—তাহারা ভাবুক নহে—আমরা কেবলি ভাবে দেশ মাতাইব। সমস্ত দেশ জুড়িয়া আমরা ভাবের ভৈরবী-চক্র বসাইয়া দিলাম; মন্ত্র এই হইল—

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পততি ভূতলে
উত্থায়চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জ্জন্মো ন বিদ্যতে।

চেষ্টা নহে, কর্ম্ম নহে, কিছুই গড়িয়া তোলা নহে, কেবল ভাবোচ্ছ্বাসই সাধনা, মত্ততাই মুক্তি।

অনেককেই আহ্বান করিলাম, অনেককেই সমবেত করিলাম, জনতার বিস্তার দেখিয়া আনন্দিত হইলাম কিন্তু এমন করিয়া কোন কাজের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিলাম না যাহাতে উদ্বোধিত শক্তিকে সকলে সার্থক করিতে পারে। কেবল উৎসাহই দিতে লাগিলাম কাজ দিলাম না। মানুষের মনের পক্ষে এমন অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার আর কিছুই নাই। মনে করিলাম উৎসাহে মানুষকে নির্ভীক করে এবং নির্ভীক হইলে মানুষ কর্ম্মের বাধা বিপত্তিকে লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু এইরূপ লঙ্ঘন করিবার উত্তেজনাই ত কর্ম্ম সাধনের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ নহে—স্থিরবুদ্ধি লইয়া বিচারের শক্তি, সংযত হইয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি, যে, তাহার চেয়ে বড়। এই জন্যই মাতাল হইয়া মানুষ খুন করিতে পারে কিন্তু মাতাল হইয়া কেহ যুদ্ধ করিতে পারে না। যুদ্ধের মধ্যে কিছু পরিমাণ

মত্ততা নাই তাহা নহে কিন্তু অপ্রমত্ততাই প্রভু হইয়া তাহাকে চালিত করে। সেই স্থিরবুদ্ধি দূরদর্শী কর্ম্মোৎসাহী প্রভুকেই বর্ত্তমান উত্তেজনার দিনে দেশ খুঁজিয়াছে, আহ্বান করিয়াছে, ভাগ্যহীন দেশের দৈন্যবশতঃ তাঁহার ত সাড়া পাওয়া যায় না। আমরা যাহারা ছুটিয়া আসি কেবল মদের পাত্রে মদই ঢালি। ইঞ্জিনে ষ্টিমের দমই বাড়াইতে থাকি। যখন প্রশ্ন উঠে,—পথ সমান করিয়া রেল বসাইবার আয়োজন কে করিবে, তখন আমরা উত্তর করি,—এ সমস্ত নিতান্ত খুচরা কাজের হিসাব লইয়া মাথা বকাইবার প্রয়োজন নাই—সময় কালে আপনিই সমস্ত হইয়া যাইবে—মজুরের কাজ মজুররাই করিবে কিন্তু আমরা যখন চালক তখন আমরা কেবল এঞ্জিনে দম চড়াইতে থাকিব।

এ পর্য্যন্ত যাহারা সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন তাহারা হয়ত আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন,—তবে কি বাংলা দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যে উত্তেজনার উদ্রেক হইয়াছে তাহা হইতে কোন শুভ ফল প্রত্যাশা করিবার নাই?

নাই এমন কথা আমি কখনো মনে করি না। অসাড় শক্তিকে সচেষ্ট সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য এই উত্তেজনার প্রয়োজন ছিল কিন্তু সচেতন করিয়া তুলিয়া তাহার পরে কি করিতে হইবে? যে পরিমাণ মদে ক্ষীণ প্রাণকে কাজের উপযোগী করিয়া তোলে তাহার চেয়ে বেশি মদে পুনশ্চ তাহার কাজের উপযোগিতা নষ্ট করিয়াই দেয়, যে সকল সত্য কর্ম্মে ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন সে কাজে মাতালের শক্তি এবং অভিরুচি বিমুখ হইয়া উঠে। ক্রমে উত্তেজনাই তাহার লক্ষ্য হয় এবং সে দায়ে পড়িয়া কাজের নামে এমন সব অকাজের সৃষ্টি করিতে

থাকে যাহা তাহার মত্ততারই আনুকূল্য করিতে পারে। এই সকল উৎপাত ব্যাপারকে বস্তুত তাহারা মাদক স্বরূপেই ব্যবহার করে অথচ তাহাতে স্বদেশহিত নাম দিয়া উত্তেজনাকে উচ্চ স্বরেই বাঁধিয়া রাখে। হৃদয়াবেগ জিনিষটা উপযুক্ত কাজের দ্বারা বহির্মুখ না হইয়া যখন কেবলি অন্তরে সঞ্চিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে তখন তাহা বিষের মত কাজ করে—তাহার প্রয়োজনীয় উদ্যম আমাদের স্নায়ুমণ্ডলকে বিকৃত করিয়া কর্ম্মসভাকে নৃত্যসভা করিয়া তোলে।"

(বঙ্গদর্শন, ১৩১৫)

মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সংগ্রামে যখন সরকারের অত্যাচার, নির্যাতন ও বেত্রাঘাত দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা নির্ব্বিশেষের উপর দিয়ে ঝড়ের মত বয়ে চলেছিলো, দেশবাসী যখন তাহা অকাতরে সহ্য ক'রে আত্মিক শক্তির মাহাত্ম্যকে জগৎ সমক্ষে বড় ক'রে ধ'রে জাতীয় আদর্শের পথে অটল হ'য়ে থাকতে লাগ্‌ল তখন রবীন্দ্রনাথ এই মহা দুর্য্যোগকে আনন্দরূপে বরণ ক'রে সুদূর রাশিয়া হ'তে ভারতবর্ষে আশার বাণী বর্ষণ করেছিলেন। তাঁর জীবনে বহুকালের স্বপ্ন যেন এই অহিংস সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছিলো। সমগ্র বিশ্বে সেদিন ইহার মহত্ত্ব ছড়িয়ে প'ড়ে ভারতবর্ষকে গৌরবে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছিল। পশুবলকে অবনত করবার জন্যে দেশে যে সত্যকার সাধনা আরম্ভ হয়েচে তা উপলব্ধি ক'রে কবি পরম উৎসাহে বলেছিলেন—

"যে বাঁধনে দেশকে জড়িয়েচে টান মেরে মেরে সেটা ছিঁড়তে হয়। প্রত্যেক টানে চোখের তারা উল্টে যায়, কিন্তু এ ছাড়া বন্ধন-

মুক্তির অন্য উপায় নেই। বৃটিশ-রাজ নিজের বাঁধন নিজের হাতেই ছিঁড়চে, তাতে আমাদের তরফে বেদনা যথেষ্ট, কিন্তু তার তরফে লোকসান্ কম নয়। সকলের চেয়ে বড়ো লোকসান্ এই যে, বৃটিশ-রাজ আপন মান খুইয়েচে। ভীষণের দুর্ব্বৃত্ততাকে আমরা ভয় করি, সেই ভয়ের মধ্যেও সম্মান আছে, কিন্তু কাপুরুষের দুর্ব্বৃত্ততাকে আমরা ঘৃণা করি। বৃটিশসাম্রাজ্য আজ আমাদের ঘৃণায় ধিকৃত। এই ঘৃণায় আমাদের জোর দেবে, এই ঘৃণার জোরেই আমরা জিতবো।"

* * * * *

"দেশে বিদেশে ভারতবর্ষ আজ গৌরব লাভ করেচে কেবল মাত্র মারকে স্বীকার না ক'রে। দুঃখকে উপেক্ষা করবার সাধনা আমরা যেন কিছুতে না ছাড়ি। পশুবল কেবলই চেষ্টা করচে আমাদের পশুকে জাগিয়ে তুল্‌তে, যদি সফল হতে পারে তবেই আমরা হারবো। দুঃখ পাচ্চি সে জন্যে আমরা দুঃখ করবো না। এই আমাদের প্রমাণ করবার অবকাশ এসেচে যে, আমরা মানুষ—পশুর নকল করতে গেলেই এই শুভ যোগ নষ্ট হবে। শেষ পর্য্যন্ত আমাদের বল্‌তে হবে—ভয় করি নে। বাংলা দেশের মাঝে মাঝে ধৈর্য্য নষ্ট হয়, সেইটেই আমাদের দুর্ব্বলতা। আমরা যখন নখ দন্ত মেল্‌তে যাই তখনই তার দ্বারা নখীদন্তীদের সেলাম করা হয়। উপেক্ষা করো, নকল ক'রো না। অশ্রু বর্ষণ নৈব নৈব চ।"

(প্রবাসী, ১৩৩৭)

ইংরেজের হাত হ'তে আমাদের অধিকার নিতে হ'লে তা কখনো আমাদের দুর্ব্বলতার দ্বারা হবে না। আমাদের সবল মনের শক্তি যখন তাদের কাছে প্রকাশ হ'য়ে পড়বে, আমরা যখন প্রমাণ করতে পারব যে, যারা আমাদের মনিব তারা কত বড় নিকৃষ্ট পশুবৃত্তির আশ্রয় নিয়ে আমাদের উপর প্রভুত্ব চালাচ্চে আর আমরা তাদের চেয়ে সভ্যতায় মনুষ্যত্বে কত বড় উন্নততর স্তরে গিয়ে পৌছেচি ও বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে একটা দুর্নীতিপরায়ণ নিকৃষ্ট শক্তির কাছে মাথা হেঁট ক'রে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েচি; তখন বিশ্বের বিচারদণ্ড অলক্ষ্যে এসে এ কঠিন রাজদণ্ডকে আঘাত ক'রে ধূলিশায়ী করে দেবে। অতএব এই সাধনামার্গে আমাদিগকে খাঁটি সহিষ্ণু ও শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হ'লে রাজনীতি-ক্ষেত্রে ইংরেজের প্রতি অসংযত ক্রোধ প্রকাশ, ইংরেজের দেওয়া উপাধি, সম্মান ও চাকুরী গ্রহণের হীন বৃত্তি হতে নিজেদের মুক্ত ক'রে তুলতে হবে। বহু দুঃখ ও অত্যাচারের মধ্যেও আমাদের মহত্ত্ব দিয়ে ইংরেজের মনের ঘোর অন্ধকারকলুষ ধুয়ে দিতে হবে ও তাদের হীন পশুত্ব ঘুচিয়ে দিতে হবে। নিরস্ত্র ভারতবর্ষের ইহা ছাড়া অন্য কোন বড় সম্বল ও সম্পদ নেই।

আমাদের কর্ম্মপ্রভাব যেদিন আমাদের সকল অভাব ও অন্ধকার মোচন ক'রে দেবে, যেদিন সমগ্র দেশকে আমরা নিজেদের চেষ্টায় আপনার ক'রে নেব ও নিজেদের অধিকার বিস্তারে যাত্রাপথ প্রশস্ত ক'রে তুলব সেদিন ইংরেজ আপনা হতেই আমাদের সঙ্গে আপোস ক'রে চলতে বাধ্য হবে। আমাদের দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ আমরা খাঁটি জিনিষের সঙ্গে অনেক সময় বঞ্চনা ক'রে চলতে চাই। যার মধ্যে কোন সাধনা নেই, যে নিজে বা নয় প্রয়োজনের খাতিরে তার মিছামিছি অভিনয় করতে

যাওয়া দুর্ব্বলতার প্রধান লক্ষণ। দুর্ব্বলতা দিয়ে দুর্ব্বলতাকে জয় করা যায় না। তাই ভারতবর্ষের সঙ্গে য়ুরোপের মিল হয় না। বহুদিন পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ এ সমস্যা সম্বন্ধে সুগভীর চিন্তা করে বলেছিলেন—

"ইংরেজের যাহা শ্রেষ্ঠ যাহা সত্য তাহার সহিত আমাদের যদি সংশ্রব না ঘটে, ইংরেজের মধ্যে যদি প্রধানতঃ আমরা সৈনিকের বা বণিকের পরিচয় পাই, অথবা যদি কেবল শাসনতন্ত্রচালকরূপে তাহাকে আফিসের মধ্যে যন্ত্রারূঢ় দেখিতে থাকি, যে ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষ আত্মীয়ভাবে মিশিয়া পরস্পরকে অন্তরে গ্রহণ করিতে পারে, সে ক্ষেত্রে যদি তাহার সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ না থাকে, যদি পরস্পর ব্যবহিত হইয়া পৃথক হইয়া থাকি তবে আমরা পরস্পরের পক্ষে পরম নিরানন্দের বিষয় হইয়া উঠিবই। এরূপ স্থলে প্রবল পক্ষ সিডিসনের আইন করিয়া দুর্ব্বল পক্ষের অসন্তোষকে লোহার শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে অসন্তোষকে বাঁধিয়াই রাখা হইবে, তাহাকে দূর করা হইবে না।

* * * *

"ভারতবর্ষে ইংরেজ আগমনের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ তাহা হইতে ইংরেজ আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছে; আমাদের আত্মশক্তিকে বাধাগ্রস্ত এবং আত্মসম্মানকে খর্ব্ব করিতেছে। সুশাসন এবং ভাল আত্মাই যে মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় লাভ তাহা নহে। আফিস আদালত আইন এবং শাসন ত মানুষ

নয়। মানুষ যে মানুষকে চায়—তাহাকে যদি পায় তবে অনেক দুঃখ অনেক অভাব সহিতেও সে রাজি আছে। মানুষের পরিবর্ত্তে বিচার এবং আইন রুটির পরিবর্ত্তে পাথরেরই মত। সে পাথর দুর্লভ এবং মূল্যবান্ হইতে পারে কিন্তু তাহাতে ক্ষুধা দূর হয় না।

এইরূপে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সম্যক মিলনের বাধা ঘটিতেছে বলিয়াই আজ যত কিছু উৎপাত জাগিয়া উঠিতেছে। কাছে থাকিব অথচ মিলিব না, এ অবস্থা মানুষের পক্ষে অসহ্য এবং অনিষ্টকর। সুতরাং একদিন না একদিন ইহার প্রতিকারের চেষ্টা দুর্দ্দম হইয়া উঠিবেই। এ বিদ্রোহ নাকি হৃদয়ের বিদ্রোহ, সেই জন্য ইহা ফলাফলের হিসাব বিচার করে না, ইহা আত্মহত্যা স্বীকার করিতেও প্রস্তুত হয়।

* * * *

"সকলদিকেই আমাদিগকে শক্তিশালী হইতে হইবে; তবেই ভারতবর্ষকে ইংরেজ যাহা দিতে আসিয়াছে, তাহা দিতে পারিবে। যতদিন তাহারা আমাদিগকে অবজ্ঞা করিবে, ততদিন ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিলন হইতে পারিবে না। আমরা রিক্ত হস্তে তাহাদের দ্বারে দাঁড়াইলে বারবার ফিরিয়া আসিতে হইবে।

* * * *

"ইংরাজের মধ্যে যাহা সকলের চেয়ে বড় এবং সকলের চেয়ে ভাল তাহা আরামে গ্রহণ করিবার নহে, তাহা আমাদিগকে জয় করিয়া লইতে হইবে। ইংরেজ যদি দয়া করিয়া আমাদের প্রতি ভাল হয় তবে তাহা আমাদের পক্ষে ভাল হইবে না। আমরা মনুষ্যত্ব দ্বারা তাহার মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করিয়া লইব। ইহা ছাড়া সত্যকে গ্রহণ করিবার আর কোন সহজ পন্থা নাই। একথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইংরেজের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা ইংরেজের কাছেও কঠিন দুঃখেই উপলব্ধ হইয়াছে, তাহা দারুণ মন্থনে মথিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার যথার্থ সাক্ষাৎ লাভ যদি করিতে চাই তবে আমাদের মধ্যেও শক্তির আবশ্যক। আমাদের মধ্যে যাহারা উপাধি সম্মান বা চাকরীর লোভে হাত জোড় করিয়া মাথা হেঁট করিয়া ইংরাজের দরবারে উপস্থিত হয়, তাহারা ইংরেজের প্রকাশকে বিকৃত করিয়া দেয়। অন্যপক্ষে যাহারা কাণ্ডজ্ঞানহীন অসংযত ক্রোধের দ্বারা ইংরেজকে উন্মত্তভাবে আঘাত করিতে চায়, তাহারা ইংরেজের পাপ প্রকৃতিকেই জাগরিত করিয়া তোলে। ভারতবর্ষ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ইংরেজের লোভকে ঔদ্ধত্যকে, ইংরেজের কাপুরুষতা ও নিষ্ঠুরতাকেই উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে, এ যদি সত্য হয় তবে এজন্য ইংরেজকে দোষ দিলে চলিবে না, এ অপরাধের প্রধান অংশ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

* * * *

"এখনকার ইংরেজ-সমাজ হয় সিভিলিয়ান-সমাজ, নয় বণিক-সমাজ, নয় সৈনিক-সমাজ। তাহারা তাহাদের বিশেষ কার্য্যক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতার দ্বারা আবদ্ধ। এই সকল ক্ষেত্রের সংস্কারসকল মর্য্যাদাই

তাহাদের চারিদিকে কঠিন আবরণ রচনা করিতেছে, বৃহৎ মনুষ্যত্বের সংস্পর্শে এই আবরণ ক্ষয় করিয়া ফেলিবার জন্য কোনো শক্তি তাহাদের চারিদিকে প্রবল ভাবে কাজ করিতেছে না। তাহারা এদেশের হাওয়ায় কেবল কড়া সিভিলিয়ান, পুরা সদাগর এবং ষোলআনা সৈনিক হইয়া পাকিয়া উঠিতে থাকে? এই কারণেই ইহাদের সংশ্রবকে আমরা মানুষের সংস্রব বলিয়া অনুভব করিতে পারি না। এই জন্যই যখন কোন সিভিলিয়ান হাই কোর্টের জজের আসনে বসে, তখন আমরা হতাশ হই; কারণ তখন আমরা জানি, এ লোকটির কাছ হইতে যথার্থ বিচারকের বিচার পাইব না, সিভিলিয়ানের বিচারই পাইব; সে বিচারে ন্যায়ধর্ম্মের সঙ্গে যেখানে সিভিলিয়ানের ধর্ম্মের বিরোধ ঘটিবে, সেখানে সিভিলিয়ানের ধর্ম্মই জয়ী হইবে। এই ধর্ম্ম ইংরেজের শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিরও বিরুদ্ধ, ভারতবর্ষেরও প্রতিকূল।

আবার যে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজের কারবার, সেই ভারতবর্ষের সমাজ ও নিজের দুর্গতি দুর্ব্বলতাবশতঃই ইংরেজের ইংরেজত্বকে উদ্বোধিত করিয়া রাখিতে পারিতেছে না, সেইজন্য যথার্থ ইংরেজ এদেশে আসিলে ভারতবর্ষ যে ফল পাইত সেই ফল হইতে সে বঞ্চিত হইতেছে। সেই জন্যই সে পশ্চিমের বণিক সৈনিক এবং আফিস আদালতের বড়সাহেবদের সঙ্গেই আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে, পশ্চিমের মানুষের সঙ্গে পূর্ব্বের মানুষের মিলন ঘটিল না, পশ্চিমের সেই মানুষ প্রকাশ পাইতেছে না বলিয়াই এদেশে যাহা কিছু বিপ্লব বিরোধ, আমাদের যাহা কিছু দুঃখ অপমান। এবং এই যে প্রকাশ পাইতেছে না এমন কি প্রকাশ বিকৃত হইয়া যাইতেছে, সে জন্য আমাদের পক্ষেও যে পাপ আছে, তাহা

আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য" পরমাত্মা বলহীনের কাছে প্রকাশ পান না, কোন মহৎ সত্যই বলহীনের দ্বারা লভ্য নহে; যে ব্যক্তি দেবতাকে চায় তাহার প্রকৃতিতে দেবতার গুণ থাকা আবশ্যক।

শক্ত কথা বলিয়া বা অকস্মাৎ দুঃসাহসিক কাজ করিয়া বল প্রকাশ হয় না। ত্যাগের দ্বারাই বলের পরিচয় ঘটে। ভারতবাসী যতক্ষণ পর্য্যন্ত ত্যাগশীলতার দ্বারা শ্রেয়কে বরণ করিয়া না লইবে, ভয়কে স্বার্থকে আরামকে সমগ্র দেশের হিতের জন্য ত্যাগ করিতে না পারিবে, ততক্ষণ ইংরেজের কাছে, যাহা চাহিব তাহা ভিক্ষা চাওয়াই হইবে। এবং যাহা পাইব তাহাতে লজ্জা এবং অক্ষমতা বাড়িয়া উঠিবে। নিজের দেশকে যখন আমরা নিজের চেষ্টা নিজের ত্যাগের দ্বারা নিজের করিয়া লইব, যখন দেশের শিক্ষার জন্য স্বাস্থ্যের জন্য আমাদের সমস্ত সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়া দেশের সর্ব্বপ্রকার অভাব মোচন ও উন্নতি সাধনের দ্বারা আমরা দেশের উপর আমাদের সত্য অধিকার স্থাপন করিয়া লইব, তখন দীন ভাবে ইংরেজের কাছে দাঁড়াইব না। তখন ভারতবর্ষে আমরা ইংরাজের সহযোগী হইব, তখন আমাদের সঙ্গে ইংরেজকে আপোস করিতেই হইবে, তখন আমাদের পক্ষে দীনতা না থাকিলে ইংরেজের পক্ষেও হীনতা প্রকাশ পাইবে না। আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত বা সামাজিক মূঢ়তাবশতঃ নিজের দেশের লোকের প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিতে না পারিব, যতক্ষণ আমাদের দেশের জমিদার প্রজাদিগকে নিজের সম্পত্তির অঙ্গমাত্র বলিয়া গণ্য করিবে, আমাদের দেশের প্রবল পক্ষ দুর্ব্বলকে পদানত করিয়া রাখাই সনাতন নীতি বলিয়া জানিবে, উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণকে

পশুর অপেক্ষা ঘৃণা করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা ইংরেজের নিকট হইতে সদ্ব্যবহারকে প্রাপ্য বলিয়া দাবী করিতে পারিব না। ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইংরেজের প্রকৃতিকে আমরা সত্যভাবে উদ্বোধিত করিতে পারিব না এবং ভারতবর্ষ কেবলি বঞ্চিত অবমানিত হইতে থাকিবে। ভারতবর্ষ আজ সকল দিক হইতে শাস্ত্রে সমাজে ধর্ম্মে নিজেকেই নিজে বঞ্চনা ও অপমান করিতেছে; নিজের আত্মাকেই সত্যের দ্বারা ত্যাগের দ্বারা উদ্বোধিত করিতেছে না; এই জন্যই অন্যের নিকট হইতে যাহা পাইবার তাহা পাইতেছে না। এই জন্যই পশ্চিমের সঙ্গে মিলন ভারবর্ষে সম্পূর্ণ হইতেছে না, সে মিলনে পূর্ণ ফল জন্মিতেছে না, সে মিলনে আমরা অপমান এবং পীড়াই ভোগ করিতেছি। ইংরেজকে ছলে বলে ঠেলিয়া ফেলিয়া আমরা এই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগ পরিপূর্ণ হইলে, এই সংঘাতের সমস্ত প্রয়োজন সমাপ্ত হইয়া যাইবে। তখন ভারতবর্ষে দেশের সঙ্গে দেশের, জাতির সঙ্গে জাতির, জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের, চেষ্টার সঙ্গে চেষ্টার যোগ সাধন হইবে, তখন বর্ত্তমানে ভারত ইতিহাসের যে পর্ব্বটি চলিতেছে, সেটা শেষ হইয়া যাইবে এবং পৃথিবীর মহত্তর ইতিহাসের মধ্যে সে উত্তীর্ণ হইবে।"

(পূর্ব্ব ও পশ্চিম—সমাজ, ১৩১৫)

* * * *

"দেশব্যাপী চাকরীর তাড়নায় আজ সমস্ত বাঙালী জাতি দুর্ব্বল, লাঞ্ছিত, আনন্দহীন। এই চাকরীর মায়ায় বাংলার বহুতর

সুযোগ্য শিক্ষিত লোক কেবল যে অপমানকে সম্মান বলিয়া গ্রহণ করিতেছে তাহা নহে, তাহারা দেশের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে বাধ্য হইতেছে, আজ তাহার দৃষ্টান্ত দেখ। বিধাতার লীলাসমুদ্র হইতে জোয়ার আসিয়া আজ যখন সমস্ত দেশের হৃদয়স্রোত আত্মশক্তির পথে মুখ ফিরাইয়াছে তখন বিমুখ কারা? তখন গোয়েন্দাগিরি করিয়া সত্যকে মিথ্যা করিয়া তুলিতেছে কারা? তখন ধর্ম্মাধিকরণে বসিয়া অন্যায়ের দণ্ডে দেশপীড়নের সাহায্য করিতেছে কারা? তখন, বালকদের অতিগুরু সম্বন্ধ গ্রহণ করিয়াও তাহাদিগকে অপমান ও নির্যাতনের হস্তে অনায়াসে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইতেছে কারা? যারা চাকরীর ফাঁস গলায় পরিয়াছে। তারা যে, কেবল অন্যায় করিতে বাধ্য হইতেছে তাহা নয়—তারা নিজেকে ভুলাইতেছে—তারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে যে, দেশের লোক ভুল করিতেছে। বল দেখি দেশের যোগ্যতম শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কণ্ঠে এই যে চাকরী শিকলের টান, ইহা কি প্রাণান্তকর টান! এই টানকে আমরা প্রত্যহই বাড়াইয়া তুলিতেছি কি করিয়া? নবাবিয়ানা, সাহেবিয়ানা, বাবুয়ানাকে প্রত্যহই উগ্রতর করিয়া মনকে বিলাসের অধীন করিয়া আপন দাসখতের মেয়াদ এবং কড়ার বাড়াইয়া চলিয়াছি। জীবনযাত্রাকে লঘু করিবামাত্র দেশব্যাপী এই চাকরীর ফাঁসি এক মুহূর্ত্তে আলগা হইয়া যাইবে। তখন অকাতরে এত অপমান সহ্য করিয়া পড়িয়া থাকা সহজ হইবে না।

(বিলাসের ফাঁস—"সমাজ", ১৩১২)

য়ুরোপ ও ভারতবর্ষের এ বিরাট মিলন সমস্যায় ইংরেজের তরফ

কঠিন হয়ে রয়েছে তাঁহাও হতেও বহু অচল অন্তরায় পর্ব্বতের মত একটা আলোচনার বিষয়। ইংরেজেরা এদেশে ভারতবাসীর আত্মীয় হয়ে আসেনি তারা আত্মীয়তা করতে চায় বলেও মনে হয় না। তারা এসেচে বণিক হয়ে, সিভিলিয়ান হয়ে, খনির অধিপতি হয়ে এদেশে আফিসি রাজত্ব চালাতে। কেউ নেয় মোটা মোটা মাইনে, কেউ নেয় জাহাজ ভর্ত্তি রত্নরাজি! এভাবে তারা আফিসি চাল্ বজায় রেখে ছুটির দিন গুণে গুণে ডাইনীর মত এদেশের রক্ত শুষে ঘরে ফেরে ও প্রাণহীন রাজ্য চালানোর প্রহসন করে। এভাবে তারা পরম আত্মীয়তার নামে নির্ম্মম বঞ্চনায় বিরাট অসন্তোষের মেঘ বিস্তার ক'রে ভারতের হৃদয়াকাশ অন্ধকার ক'রে দিয়েচে, এর ভিতর দিয়ে রাজা-প্রজার মধ্যে দীর্ঘদিন মিলন-সম্বন্ধ থাকতে পারে না। সে প্রজাই হোক আর পশুই হোক তার অন্তরের দীর্ঘ দিনের সুপ্তি জড়তা চোখ মেলে বীর্য্যবানের রূপ নিয়ে রাজার উপরে রাজত্ব কর্‌বার নূতন দায়িত্ব ঘোষণা ক'রে দেয়। তখন শাসনের কঠোর হস্ত ও আইনের তীব্র কটাক্ষ জাগ্রত মানবত্মাকে কিছুতেই ফেরাতে পারে না, সে জানে মানুষ আইন ও মেসিনের চাইতে অনেক বড়। মেসিনের রাজত্ব তখন আর টেঁকে না। রবীন্দ্রনাথ তাই এই বিরোধী মনের মিলনের জন্যে শক্তি অর্জ্জনের কথা বলেই বলেছিলেন—

"যাহারা পথিক মাত্র—ছুটির দিকেই যাহাদের মন পড়িয়া আছে, যাহারা পেটের দায়ে নির্ব্বাসনে দিন যাপন করিতেছে, যাহারা বেতন লইয়া এই শাসন-কারখানার কল চালাইয়া যাইতেছে, যাহাদের সহিত আমাদের সামাজিক কোন সম্বন্ধ নাই—অহরহ পরিবর্ত্তমান এমন উপেক্ষাপরায়ণ জনসম্প্রদায়ের হৃদয়

সম্পর্কশূন্য আপিসি শাসন নিরন্তর বহন করা যে কি দুর্ব্বিষহ তাহা ভারতবর্ষই জানে। রাজভক্তিতে দীক্ষিত ভারতবর্ষের অন্তঃকরণ কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেছে যে—হে ভারতের প্রতি বিমুখ-ভগবান, আমি এই সকল ক্ষুদ্র রাজা ক্ষণিকরাজা অনেকরাজা আর সহিতে পারি না, আমাকে একরাজ্য দাও। এমন রাজা দাও যিনি বলিতে পারিবেন—ভারতবর্ষ আমারই রাজ্য; বণিকের নয়, খনিকের নয়, চা-করের নয়, ল্যাঙ্কশিয়রের নয়;—ভারতবর্ষ যাঁহাকে অন্তরের সহিত বলিতে পারিবে—আমারই রাজা; হ্যালিডে-রাজা নয়, ফুলের রাজা নয়, পায়োনিয়র-সম্পাদক রাজা নয়। রাজপুত্র আসুন, ভারতের রাজতক্তে বসুন, তাহা হইলে স্বভাবতই তাঁহার নিকট ভারতবর্ষ মুখ্য এবং ইংলণ্ড গৌণ হইয়া উঠিবে। তাহাতেই ভারতের মঙ্গল এবং ইংলণ্ডের স্থায়ী লাভ। মানুষকে কল দিয়া শাসন করিব, তাহার সহিত হৃদয়ের সম্পর্ক, সমাজের সম্পর্ক রাখিব না, এ স্পর্দ্ধা ধর্ম্মরাজ কখনই চিরদিন সহ্য করিতে পারে না—ইহা স্বাভাবিক নহে, ইহা বিশ্ববিধানকে পীড়িত করিতে থাকে। সেইজন্য সুশাসনই বল শান্তিই বল, কিছুর দ্বারাই এই দারুণ হৃদয়-দুর্ভিক্ষ পূরণ হইতে পারে না। একথা শুনিয়া আইন ক্রুদ্ধ হইতে পারে, পুলিশ সর্পফণা তুলিতে পারে; কিন্তু যে ক্ষুধিত সত্য ত্রিশ কোটি প্রজার মর্ম্মের মধ্যে হাহাকার করিতেছে, তাহাকে বলের দ্বারা উচ্ছেদ করিতে পারে এমন শাসনের উপায় কোন মানবের হাতে নাই, কোন দানবের হাতেও নাই।"

(রাজাপ্রজা, ১৩১২)

সমাজ ও সভ্যতায় রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জাতির রাজনৈতিক দুর্দ্দশার কথা গভীর ভাবে নানা রকমে চিন্তা ক'রে ঘরে বাহিরের দোষ ত্রুটির কথা ও সমস্যা সমাধানের কথা সাধারণ ভাবে আলোচনা করেই নিবৃত্ত হন নি। তার পরে জাতির প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ দুঃখতাপজর্জ্জরিত জীবন কেন্দ্রে কেন্দ্রে তিনি তাঁর চিন্তাধারাকে মুক্ত ক'রে দিয়েচেন। একটি জাতিকে খাড়া হয়ে উঠ্‌তে হলে তার সমাজ, শিক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতি সকল দিকেই শক্ত মেরুদণ্ড গঠিত হয়ে ওঠা দরকার।

বৈদেশিক শাসনে একদিকে যেমন দেশের মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে নৈতিক অধঃপতন ঘট্‌চে ও ক্রমে পাশবিক প্রভাবের প্রাচুর্য্যে দেশবাসী পশুভাবাপন্ন হওয়ার পথে চলেচে তেমনি আর একদিক দিয়ে কলওয়ালার ব্যবসাবাণিজ্যের মহিমায় দেশের কারিকরদিগের কর্ম্ম বন্ধ হয়ে গিয়েচে, গৃহশিল্প নষ্ট হয়ে গিয়েচে ও শিল্পীর স্বাধীন অর্থ উপার্জ্জনের পথ ধ্বংসপ্রায়, তাই তা'দিগকে কলের কুঠরীতে রাতদিন কঠোর কুলীর কাজ করতে হচ্চে। হাজার হাজার কুলী তাদের দৈনন্দিন উপজীবিকার মুষ্টিমেয় অর্থ উপার্জ্জন করতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে লক্ষপতি কলের মালিককে ক্রোরপতি করে দিচ্চে। একজন প্রাচুর্য্যের গৌরবে ধরাকে সরা জ্ঞান ক'রে চলেচে, আর লক্ষ লক্ষ কঙ্কালসার অভাবগ্রস্ত কুলী যমের দুয়ার সাফ করতে বসেচে। এই যে বিরাট ধনবৈষম্য ইহাকে দূর করে দিয়ে উৎপন্ন ধনের উপযুক্ত বণ্টন সমাজের মধ্যে প্রচলন করবার যে একটা আসন্ন প্রয়োজন রয়েচে তার জন্যে রবীন্দ্রনাথ বহু কাল পূর্ব্বেই দেশের দৈন্যপীড়িত জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি-

সম্পন্ন ও দরদী হয়েই আলোচনা করে ছিলেন। এই ধনের ও ধনীর অধীনতা, স্বাধীনতার পথে কম প্রতিবন্ধক নয়।

"সোশ্যালিজম্ ধনীর কর্ত্তৃত্বের স্থলে মানব-সাধারণের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে। কলের সৃষ্টি হওয়ার পর হইতে একটি নূতন বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। কলের দ্বারা দুইটি দলের উৎপত্তি হইয়াছে। এক কলওয়ালা নব্য উন্নতিশীল, আর এক কর্ম্মচ্যুত প্রাচীন কারীকরের দল।

এক সময় ছিল যখন কারিকরের ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের উপরে পণ্য নির্ভর করিত। তখন তাহাদের অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা ছিল। আপনার বুদ্ধি ও কৌশলের জোরে কারিকর অনেকটা নিজের গুমরে থাকিতে পারিত।

এখন কলে পণ্য উৎপন্ন এবং বিতরিত হওয়ায় কারিকরের নৈপুণ্যজাত স্বাধীনতার স্বভাবতই হ্রাস হইয়া কলওয়ালা ধনীর ক্ষমতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিয়াছে।

সোশ্যালিষ্টরা চাহে, যে, এই পণ্য উৎপাদন ও বিতরণ কোন বিশেষ ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তির হস্তে না থাকিয়া সাধারণ সমাজের হস্তে পড়ে। তাহারা বলে, ধন উৎপাদন এবং বণ্টন সমস্ত সমাজের কজি। সম্প্রতি কেবল সম্পত্তিবান্ ব্যক্তিদের মর্জ্জি এবং স্বার্থের উপরে তাহার নির্ভর থাকাতে জন-সাধারণ স্ব স্ব অবস্থার সম্পূর্ণ উন্নতির সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

ধনের অধীনতা সামান্য নহে। ডাকাত যদি পিস্তল দেখাইয়া বলে 'টাকা দে, নয় মারিব' সেও যেমন, তেমনি কলওয়ালা মহাজন যখন বলে, হয় এমনি করিয়া খাট, নয় মর', সেও তদ্রূপ। যে

নির্ধন সে একেবারে নিরুপায়। যখন ধন এবং জমী সাধারণের মধ্যে বিলি হইবে তখন এমন দৌরাত্ম্য হইতে পারিবে না।"

(সাধনা, ১২৯৯)

* * * *

"ধনী দরিদ্রের প্রভেদ থাকাতে ধনের পুঞ্জীভূত রূপ সবচেয়ে বড়ো করে চোখে পড়ে—দারিদ্র্য থাকে যবনিকার আড়ালে নেপথ্যে; সেই নেপথ্যে সব এলোমেলো, নোংরা, অস্বাস্থ্যকর, দুর্দ্দশায়, দুষ্কর্ম্মে নিবিড় অন্ধকার।"

* * * *

"ধনগত বৈষম্যের বড়াই আমাদের দেশে এসেচে পশ্চিম মহাদেশ থেকে। এক সময়ে আমাদের দেশে যখন হাল আমলের আফিস-বিহারী ও ব্যবসাদারদের ঘরে নতুন টাকার আমদানি হ'লো তখন তা'রা বিলাতী বাবুগিরির চলন সুরু ক'রে দিলো। তখন থেকে আসবাবের মাপেই ভদ্রতার পরিমাপ আরম্ভ হয়েচে। তাই আমাদের দেশেও আজকাল কুলশীল রীতিনীতি বুদ্ধিবিদ্যা সমস্ত ছাপিয়ে চোখে পড়ে ধনের বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতার গৌরবই মানুষের পক্ষে সব চেয়ে অগৌরব। এই ইতরতা যাতে মজ্জার মধ্যে প্রবেশ না করে, সে জন্যে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।"

(প্রবাসী, ১৩৩৭)

কলের কুলীর যেমন দুঃখ বেশি তেমন আর এক দিক দিয়ে চাষীর

দুঃখও কম নয়। চাষী সারা বছর নিজের বলদের পিছনে খেটে খেটে নিজে কোন বলের অধিকারী হ'লো না, সেও যেন বলদের সামিল হয়ে গেলো। জমিদারের সম্পদ বেড়েই চলেচে, কিন্তু গোড়ায় থেকে এ সম্পদের রসে জমিদারকে সতেজ ক'রে রেখেচে যে চাষী সম্প্রদায়, তাকে যদি শুকিয়ে ফেলা যায়, তার শক্তি যদি একেবারে মেরে ফেলা যায় তবে একদিন জমিদারকেও যে শোচনীয় মরণ-পথের যাত্রী হতে হবে তা জমিদার-গোষ্ঠী বুঝ্‌লো না। জগৎজোড়া দুঃখীর ঘনীভূত প্রাণের ব্যথা ও অসন্তুষ্টির ধূমায়িত বহ্নি একদিন বিরাট শক্তির সৃষ্টি ক'রে সমস্ত ধনবৈষম্যের বিষ পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দেবে। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে রাশিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে বলেচেন—

"দুঃখী আজ সমস্ত মানুষের রঙ্গভূমিতে নিজেকে বিরাট ক'রে দেখতে পাচ্চে, এইটে মস্ত কথা। আগেকার দিনে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখেচে বলেই কোনমতে নিজের শক্তিরূপ দেখতে পায়নি—অদৃষ্টের উপর ভর ক'রে সব সহ্য ক'রেচে। আজ অত্যন্ত নিরুপায়ও অন্তত সেই স্বর্গরাজ্য কল্পনা করতে পারচে, যে-রাজ্যে পীড়িতের পীড়া যায়, অপমানিতের অপমান ঘোচে। এই কারণেই সমস্ত পৃথিবীতেই আজ দুঃখজীবীরা ন'ড়ে উঠেছে।

যারা শক্তিমান তারা উদ্ধত। দুঃখীদের মধ্যে আজ যে শক্তির প্রেরণা সঞ্চারিত হয়ে তাদের অস্থির করে তুলচে তাকে বলশালীরা বাইরে থেকে ঠেকাবার চেষ্টা করুচে—তা'র দূতদের ঘরে ঢুকতে দিচ্চে না, তাদের কণ্ঠ দিচ্চে রুদ্ধ ক'রে। কিন্তু আসল যাকে সব চেয়ে ওদের ভয় করা উচিত ছিলো সে' হচ্চে দুঃখীর

দুঃখ—কিন্তু তাকেই এরা চিরকাল সব চেয়ে অবজ্ঞা কর্‌তে অভ্যস্ত। নিজের মুনফার খাতিরে সেই দুঃখকে এরা বাড়িয়ে চল্‌তে ভয় পায় না, হতভাগ্য চাষীকে দুর্ভিক্ষের কবলের মধ্যে ঠেসে ধ'রে শতকরা দুশো তিনশো হারে মুনফা ভোগ কর্‌তে এদের হৃদকম্প হয় না। কেন-না, সেই মুনফাকেই এরা শক্তি ব'লে জানে। কিন্তু মানুষের সমাজে সমস্ত আতিশয্যের মধ্যেই বিপদ, সে বিপদ্‌কে কখনোই বাইরে থেকে ঠেকানো যায় না। অতিশয় শক্তি অতিশয় অশক্তির বিরুদ্ধে চিরদিন নিজেকে বাড়িয়ে চ'ল্‌তেই পারে না। ক্ষমতাশালী যদি আপন শক্তিমদে উন্মত্ত হয়ে না থাকতো তা হ'লে সবচেয়ে ভয় ক'রতো এই অসাম্যের বাড়াবাড়িকে—কারণ, অসামঞ্জস্য মাত্রই বিশ্ববিধির বিরুদ্ধে।"

(প্রবাসী, ১৩৩৭)

এই তো গেল দুর্ব্বল দরিদ্রের কথা। তার পরে আমাদের সমাজের মধ্যে কত বিভেদ তাল পাকিয়ে রয়েচে। অস্পৃশ্যতা-রূপ একটা মহা পাপের পাষাণ বহুকাল ধ'রে উন্নতির পথের জঞ্জালস্বরূপ হয়ে আছে। একে ছোঁব না, ওকে ছোঁব না, এর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ চল্‌তে পারে না, এ ছোটলোক, ও হাড়ী, ও বাগ্দী, ওর ঘরে গেলে স্নান না করলে শুচি হওয়া যায় না, ওর হাতের জল খেলে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দানে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে সমাজে উঠ্‌তে হবে, ও লোক নীচ, মুচি—ঠাকুরঘরে সে অর্ঘ্য নিয়ে গেলে দেববিগ্রহকে স্নান করিয়ে পবিত্র কর্‌তে হবে, ইত্যাদি যে মানুষকে ঘৃণা করবার একশো রকম সমাজ-শাস্ত্রের অমূলক বাক্য রয়েচে এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বহু স্থানে বহু ভাবে তীব্র আলোচনা করেচেন ও নিজের আশ্রমে

এ ছুঁৎমার্গ পরিহারের কর্ত্তব্য পালন করা হচ্চে। এ পাপ দূর কর্‌তে না পার্‌লে, জাতীয় জীবনের বিপদজাল কেটে ওঠা মুস্কিল হবে, আস্তে আস্তে যাত্রাপথে সমস্ত দুর্ব্বলতা ও পাপই মাথা উঁচু করে এসে সমাজকে বল্‌বে, মুক্তি চাও ত আমাদের বোঝা মুক্ত ক'রে যাও। সীতা উদ্ধার কর্‌তে হলে অহল্যা উদ্ধার না কর্‌লে চল্‌বে না। তাই কবি বলেচেন—

"ইহাকে স্পর্শ করিব না, তাহার ছায়া মাড়াইব না, অমুকের অন্ন খাইব না, অমুকের কন্যা গ্রহণ করিব না, এমন করিয়া উঠিব, অমন করিয়া বসিব, তেমন করিয়া চলিব, তিথি, নক্ষত্র, দিন, ক্ষণ, লগ্ন বিচার করিয়া হাত পা নাড়িব, এমন করিয়া কর্ম্মহীন ক্ষুদ্র জীবনটাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাহনকে কড়া কড়িতে ভাঙিয়া স্তূপাকার করিয়া তুলিব, এই কি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য? হিন্দুর দেবতা, এই কি তোমার বিধান যে, আমরা কেবলমাত্র "হিন্দু" হইব, মানুষ হইব না?"

* * * *

"আমাদের দেশে সমাজনীতি ক্রমে সুদৃঢ় কঠিন হইয়াছে, কিন্তু ধর্ম্মনীতি শিথিল হইয়া আসিয়াছে। একজন লোক গরু মারিলে সমাজের নিকট নির্যাতন সহ্য করিবে এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করিবে, কিন্তু মানুষ খুন করিয়া সমাজের মধ্যে বিনা প্রায়শ্চিত্তে স্থান পাইয়াছে এমন দৃষ্টান্তের বোধ করি অভাব নাই। পাছে হিন্দুর বিধাতার হিসাবে কড়া-ক্রান্তির গরমিল হয়, এই

জন্য পিতা অষ্টম বর্ষের মধ্যেই কন্যার বিবাহ দেন এবং অধিক বয়সে বিবাহ দিলে জাতিচ্যুত হন ; বিধাতার হিসাব মিলাইবার জন্য সমাজের যদি এতই সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকে তবে উক্ত পিতা নিজের উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের শত শত পরিচয় দিলেও কেন সমাজের মধ্যে আত্মগৌরব রক্ষা করিয়া চলিতে পারে ? ইহাকে কি কাকদন্তির হিসাব বলে ? আমি যদি অস্পৃশ্য নীচ জাতিকে স্পর্শ করি, তবে সমাজ তৎক্ষণাৎ সেই দন্তি হিসাব সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করিয়া দেবে, কিন্তু আমি যদি উৎপীড়ন করিয়া সেই নীচ জাতির ভিটামাটি উচ্ছিন্ন করিয়া দিই, তবে সমাজ কি আমার নিকট হইতে সেই কাহনের হিসাব তলব করেন ? প্রতি দিন রাগ দ্বেষ লোভ মোহ মিথ্যাচরণে ধর্ম্মনীতির ভিত্তিমূল জীর্ণ করিতেছি,—অথচ স্নান তপ বিধিব্যবস্থার তিলমাত্র ত্রুটি হইতেছে না। এমন কি দেখা যায় না ?

* * * *

"আমি বলি না যে, হিন্দুশাস্ত্রে ধর্ম্মনীতিমূলক পাপকে পাপ বলে না। কিন্তু মনুষ্যকৃত সামান্য সামাজিক নিষেধগুলিকেও তাহার সম শ্রেণীতে ভুক্ত করাতে যথার্থ পাপের ঘৃণ্যতা স্বভাবতই হ্রাস হইয়া আসে। অত্যন্ত বৃহৎ ভিড়ের ভিতর শ্রেণীবিচার দুরূহ হইয়া উঠে। অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করা, এবং সমুদ্রযাত্রা হইতে নরহত্যা পর্য্যন্ত সকল পাপই আমাদের দেশে গোলে হরিবোল দিয়া মিশিয়া পড়ে।

* * * *

"পাপ খণ্ডনেরও তেমনি শত শত সহজ পথ আছে। আমাদের পাপের বোঝা যেমন দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠে, তেমনি যেখানে সেখানে তাহা ফেলিয়া দিবারও স্থান আছে। গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিলাম, অমনি গাত্রের ধূলা এবং ছোটবড় সমস্ত পাপ ধৌত হইয়া গেল। যেমন রাজ্যে বৃহৎ মড়ক হইলে প্রত্যেক মৃত দেহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গোর দেওয়া অসাধ্য হয়, এবং আমীর হইতে ফকীর পর্য্যন্ত সকলকে রাশীকৃত করিয়া এক বৃহৎ গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া সংক্ষেপে অন্ত্যেষ্টিসৎকার সারিতে হয়। আমাদের দেশে তেমনি খাইতে, শুইতে, উঠিতে বসিতে, এত পাপ যে প্রত্যেক পাপের স্বতন্ত্র খণ্ডন করিতে গেলে সময়ে কুলায় না ; তাই মাঝে মাঝে একেবারে ছোটবড় সকলগুলাকে কুড়াইয়া অতি সংক্ষেপে এক সমাধির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আসিতে হয়। যেমন বজ্র আঁটন তেমন ফস্কা গিরো।"

(আচারের অত্যাচার—"সমাজ," ১২৯৯)

সমাজের ঘৃণ্য অস্পৃশ্যতা-রূপ পাপের গণ্ডী হতে আর একটু ব্যাপক ভাবে রবীন্দ্রনাথ যখন অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত সাধারণ দরিদ্র লোকদিগের দুর্দ্দশার দিকে তাকালেন, তখনও দেখতে পেলেন সেখানেও অন্তরের করুণ কালো ব্যথার ছবি। উচ্চশ্রেণীর লোক-দিগের নির্ম্মম উপেক্ষা তাদের জীবনভরা ব্যথার বোঝাকে অহর্নিশি গুরুতর করে দিচ্ছে তা দেখে কবি সমবেদনায় ও করুণায় বিচলিত হয়ে উঠ্‌লেন। এই অখ্যাত লোকদিগের জন্যে যে মানবসভ্যতা এখনো কোন সুব্যবস্থা ক'রে উঠ্‌তে পারে নি, এখনো যারা বেশি খাটে ও বেশি শক্তি খোয়ায় তারা যে অশিক্ষিত ও অখ্যাত ব'লে

পরিমিত মর্য্যাদা ও গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে রয়েচে এজন্য রবীন্দ্রনাথ দুঃখ ক'রে এ বিপক্ষগামী সভ্যতার প্রতি কটাক্ষ করেচেন ও আরো উদার সভ্যতায় মনুষ্যত্বের দাবী জানিয়েচেন, এবং এই জগৎব্যাপী ধনী-দরিদ্রের বড়-ছোট সম্বন্ধ ও অমানুষিক নীচতার প্রতি কঠোর সমালোচনা করেচেন।

"মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তা'রাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তা'রা পালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে কম প'রে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্য্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাঁদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে—জীবনযাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ সুবিধা, সব-কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।

* * * *

"কেবলমাত্র জীবিকানির্ব্বাহ করবার জন্যে তো মনুষ্যত্ব নয়। একান্ত জীবিকাকে অতিক্রম ক'রে তবেই তা'র সভ্যতা। সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে ফ'লেচে। মানুষের সভ্যতার এক অংশে অবকাশ রক্ষা করার দরকার আছে। যে সব মানুষ শুধু অবস্থার গতিকে নয়, শরীর মনের গতিকে

নীচের তলায় কাজ ক'রতে বাধ্য এবং সেই কাজেরই যোগ্য, যথাসম্ভব তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য সুখসুবিধার জন্যে চেষ্টা করা উচিত।

* * * *

"নিরন্ন ভারতবর্ষের অন্নে ইংলণ্ড পরিপুষ্ট হয়েছে। ইংলণ্ডের অনেক লোকেরই মনের ভাব এই যে, ইংলণ্ডকে চিরদিন পোষণ করাই ভারতবর্ষের সার্থকতা। ইংলণ্ড বড়ো হ'য়ে উঠে মানব-সমাজে বড়ো কাজ করছে এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে চিরকালের মতো একটা জাতিকে দাসত্বে বদ্ধ ক'রে রেখে দিলে দোষ নেই। এই জাতি যদি কম খায় কম পরে তাতে কী যায় আসে, তবুও দয়া ক'রে তাদের অবস্থার কিছু উন্নতি করা উচিত এমন কথা তাদের মনে জাগে। কিন্তু একশো বছর হয়ে গেলো, না পেলুম শিক্ষা, না পেলুম স্বাস্থ্য, না পেলুম সম্পদ।

* * * *

"ছাঁচে ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেঁকে না—সজীব মনের তত্ত্বের সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তা হলে হয় একদিন ছাঁচ হবে ফেটে চুরমার, নয়, মানুষের মন যাবে ম'রে আড়ষ্ট হ'য়ে, কিম্বা কলের পুতুল হ'য়ে দাঁড়াবে।" (প্রবাসী, ১৩৩৭)

শিক্ষাবিস্তারে রবীন্দ্রনাথ

তার পরে রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় দুর্গতিরূপ ভীষণ সমস্যা সমাধানের উপায় চিন্তা করতে লাগলেন, এবং দেখলেন কেউ পেট ভ'রে খেয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি ধন ঐশ্বর্য্য জমা করচে, কেউ উপোষ ক'রে মরচে। কেউ ভোগবিলাসের চরম ক'রে বিবিধ অপচয়ে তৎপর হয়ে ফুর্ত্তি করচে, কেউ বা অভাবের জ্বালায় প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদে অঙ্গাবৃত করতে পারচে না। কেউ সারা বছর ছেলেপুলে মায়ে-ঝিয়ে খেটে খেটে পরিবার পালন করতে পারচে না, আবার কেউ বিনা পরিশ্রমে আরাম-কেদারায় ভোগ-ঐশ্বর্য্যের বুকে বসে মায়া-রাজ্যের সোনার স্বপ্নে বিভোর হয়ে রয়েচে। এই যে বিরাট অসাম্যের মর্ম্মন্তুদ মূর্ত্তি বিশ্বসভ্যতার দ্বারদেশে মৃত্যু-যবনিকা ফেল্‌বার জন্যে উদ্যত হয়ে রয়েচে, ইহাকে সাম্যের শুভ্র শান্ত পথে কি ক'রে পরিবর্ত্তিত করা যায় ও কি ক'রে এই সমস্ত অশক্তকে শক্তি দেওয়া যায়। ইহার একমাত্র সমাধানের প্রশস্ত উপায় হচ্চে, এক শ্রেণীর মানব-প্রকৃতিকে উদার ও প্রাণবান্ হয়ে উঠতে হবে ও আর এক শ্রেণীর প্রকৃতিকে প্রীতিপরায়ণ ও নম্রপ্রাণ হতে হবে; তা'হলেই এই দুই মনোভাব এক সময়ে সম্প্রীতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে ও পরস্পরের মধ্যে সাম্যদৃষ্টির চেষ্টা চল্‌বে। অতএব মানুষের এই বিভিন্ন মনোবৃত্তিকে আত্মীয়তা শিক্ষায় গড়ে তুল্‌তে হলে শিক্ষা বিস্তার করাই সবার চেয়ে বেশি আবশ্যকীয়। প্রত্যেক করণীয় কর্ম্ম ভাব রূপে প্রথমে মনে এক প্রকার আকার গ্রহণ করে। যার মন শিক্ষিত তার কর্ম্ম ও উপায় ভাল ভাবেই প্রকাশ পায়, তাই রবীন্দ্রনাথ জাতি-

গঠনের জন্যে সর্ব্বপ্রযত্নে শিক্ষাবিস্তারের দিকেই খুব বেশি জোর দিয়ে শান্তিনিকেতনে এত বড় শিক্ষাদানের আয়োজন ক'রে রেখেচেন।

"অশক্তকে শক্তি দেবার একটিমাত্র উপায় শিক্ষা—অন্ন স্বাস্থ্য শান্তি সমস্তই এরই 'পরে নির্ভর করে। ফাঁকা Law and Order নিয়ে না ভরে পেট না ভরে মন। অথচ তার দাম দিতে গিয়ে সর্ব্বস্ব বিকিয়ে গেল।

* * * *

"জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর; দ্বিতীয়ত, সমবায়-নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র ক'রে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না। মান্ধাতার আমলের হাল আর লাঙল নিয়ে আল-বাঁধা টুক্‌রো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসীতে জল আনা একই কথা।

* * * *

"বুদ্ধির সাহস এবং জনসাধারণের প্রতি দরদবোধ এই উভয়ের অভাব ঘটাতেই দুঃখীর দুঃখ আমাদের দেশে ঘোচানো এত কঠিন হ'য়েচে; কিন্তু এই অভাবের জন্য কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। কেন-না, কেরাণী তৈরির কারখানা বসাবার জন্যেই একদা আমাদের দেশে বণিক-রাজত্বে ইস্কুলের পত্তন

হ'য়েছিলো। ডেস্ক-লোকে মনিবের সঙ্গে সাযুজ্য লাভই আমাদের সদ্গতি।

* * * *

"ভারতবর্ষের বুকের উপর যত কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটিমাত্র ভিত্তি হ'চ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ ধর্ম্মবিরোধ, কর্ম্মজড়তা আর্থিক দৌর্ব্বল্য—সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে।" (প্রবাসী, ১৩৩৭).

শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তার কথা তো হলো। ইহার কর্ম্মপথে যে অর্থের প্রয়োজন সেদিক দিয়ে আমাদের সরকার আমাদিগকে কি সাহায্য করচেন ও কতটুকুন দরদ দেশবাসী উপভোগ করতে পাচ্চে তা একটু তলিয়ে দেখা যাক্। যখন দেশবাসী শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো, তখন দেশকে শান্ত করবার জন্যে যে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের অনুমতি পাশ হলো, তা বাইরে লাগলো চমৎকার, কিন্তু ভিতরে দেখা গেল, মাথা গড়তে গিয়ে নাড়ি-ভুঁড়ি জালিয়ে হাড়গোড় ভেঙে দেবার পন্থাটিই গড়া হয়ে গেচে সম্পূর্ণ ভাবে। যাদের পেটে ভাত নাই তারা পড়তে চাইচে, কিন্তু সেজন্যে তাদের অতিরিক্ত কর দিয়ে মরতে হবে, তা না হলে সরকারের খরচ পোষায় না। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে, সিভিল সার্ভিস, মিলিটারী, গবর্ণর, ভাইসরয় ও তাদের মোটা মাইনের সদস্য-বর্গের প্রতি দেশের সত্যিকার মঙ্গলের জন্যে যুক্তিপূর্ণ দাবীর কঠোর

ইঙ্গিত করেচেন, তাতে কবির যথেষ্ট দেশপ্রাণতার ও দরিদ্র কৃষক-প্রীতির পরিচয় পাওয়া গিয়েচে।

"দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন-উপলক্ষ্যে হুকুম পাশ হয়েচে প্রজাদের কান ম'লে শিক্ষাকর আদায় করা, এবং আদায়ের ভার পড়েচে জমিদারের 'পরে। অর্থাৎ যারা অমনিতেই আধমরা হয়ে রয়েচে, শিক্ষার ছুতো ক'রে তাদেরই মার বাড়িয়ে দেওয়া। শিক্ষাকর চাই বই কি, নইলে খরচ জোগাবে কিসে? কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্যে যে কর, কেন দেশের সবাই মিলে সে কর দেবে না? সিভিল সার্ভিস আছে, মিলিটারী সারভিস আছে, গবর্ণর ভাইসরয় ও তাঁদের সদস্যবর্গ আছেন, কেন তাঁদের পরিপূর্ণ পকেটে হাত দেবার জো নেই? তাঁরা কি এই চাষীদের অন্নের ভাগ থেকেই বেতন নিয়ে ও পেন্সন নিয়ে অবশেষে দেশে গিয়ে ভোগ করেন না? পাটকলের যে সব বড় বড় বিলাতি মহাজন পাটের চাষীর রক্ত দিয়ে মোটা মুনফার সৃষ্টি ক'রে দেশে রওনা করে, সেই মৃতপ্রায় চাষীদের শিক্ষা দিবার জন্যে তাদের কি কোনই দায়িত্ব নেই? যে সব মিনিষ্টার শিক্ষা-আইন পাশ নিয়ে ভরা পেটে উৎসাহ প্রকাশ করেন তাঁদের উৎসাহের কাণাকড়ি মূল্যও কি তাঁদের নিজের তহবিল থেকে দিতে হবে না? একেই বলে শিক্ষার জন্যে দরদ?"

(প্রবাসী, ১৩৩৭)

শিক্ষাব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী শিক্ষার কুফলের দিকটাও দেশবাসীকে অতি স্পষ্ট ক'রে দেখিয়ে দিয়েচেন। আমাদের ছেলেদের পাঠোপযোগী গ্রন্থ বড় বড় পুস্তকাগারে যথেষ্ট রয়েচে, কিন্তু তা তারা

না পড়ে যখন ছোট বয়েস হতেই ইংরেজের ছেলেদের কেতাব মুখস্ত
ক'রে গৌরব অনুভব করতে সুরু করে, তখন থেকেই তারা তাদের
দেশকে হারাতে থাকে, নিজের দেশ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জ্ঞান অর্জ্জন
হয় না, এব[ং] সেই জন্যেই দেশসেবার যোগ্য জ্ঞানের অভাবে তাদের
দ্বারা পরিণামে দেশের বিশেষ মঙ্গল প্রত্যাশাও করা যায় না। তারা
ইংরেজী সভ্যতাকেই আস্তে আস্তে আয়ত্ত করতে থাকে ও জীবনকে
নিদারুণ ব্যর্থতায় কালী করে তোলে। অবশেষে দেশের রুগ্ন, দরিদ্র,
অশিক্ষিত অসহায় দুঃখী লোকদিগের বিশেষ কিছু উপকার করতে না
পেরে কেবল তাদের কাছে গিয়ে বিদেশী পুস্তকে পড়া দেশহিতৈষণার
কথা ও বিদেশের স্বাধীনতার কল্পিত ধ্বজা ও সৈন্যসামন্তের কীর্ত্তি-
কাহিনীর কথা আওড়িয়ে বিদেশী কল্পনার নানান ছবিতে দেশের মন
ভর্ত্তি করে তোলে। তখন দেশবাসী দুঃখ দুর্দ্দশা লয়ে দেশের মাটির সম্বন্ধ
হতে মনোজগতের দিক দিয়ে আরো অনেক দূরে স'রে পড়তে থাকে ও
নিজেকে নিতান্ত নিরুপায় ক'রে তোলে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেচেন—

"বাংলা দেশের সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, লোকবিবরণ প্রভৃতি যাহা কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য, সমস্তই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়। দেশের এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার ঔৎসুক্য আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু তাহা না হইবার কারণ, আমরা শিশুকাল হইতে ইংরেজি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক, যাহা ইংরেজ ছেলেদের জন্য রচিত, তাহাই পড়িয়া আসিতেছি; ইহাতে নিজের দেশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট এবং পরের দেশের জিনিষ আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত হইয়া আসিয়াছে!

"এ জন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের দেশের যথার্থ বিবরণ আজ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই, সেই জন্য যদিও আমরা স্বদেশে বাস করিতেছি, তথাপি স্বদেশ আমাদের জ্ঞানের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া আছে।

"এইরূপে স্বদেশকে মুখ্যভাবে, সম্পূর্ণভাবে আমাদের জ্ঞানের আয়ত্ত না করিবার একটা দোষ এই যে, স্বদেশের সেবা করিবার জন্য আমরা যথার্থ যোগ্য হইতে পারি না। আর একটা কথা এই, জ্ঞানশিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। যে বস্তু চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত নাই, যে বস্তু সম্মুখে উপস্থিত নাই, আমাদের জ্ঞানের চেষ্টা যদি প্রধানত তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হইতে থাকে, তবে সে জ্ঞান দুর্লভ হইবেই। যাহা পরিচিত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে, যথার্থভাবে আয়ত্ত করিতে শিখিলে, তবে যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে।"

* * * *

"দেশের লোক রোগে মরিতেছে, দারিদ্র্যে জীর্ণ হইতেছে, অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় নষ্ট হইতেছে, ইহার প্রতিকারের জন্য যাহারা কিছুমাত্র নিজের চেষ্টা প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হয় না, তাহারা বিদেশী সাহিত্য ইতিহাসের পুঁথিগত প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্ নানা প্রকার অসঙ্গত অনুকরণের দ্বারা লাভ করিয়াছি বলিয়া কল্পনা করে। এ জন্যই, এতকাল গেল তথাপি এই প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্ আমাদিগকে যথার্থ কোন ত্যাগস্বীকারে প্রবৃত্ত করিতে পারিল না। যে দেশে

প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌ অবাস্তব নহে, পুঁথিগত অনুকরণমূলক নহে, সেখানকার লোক দেশের জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতেছে, আমরা সামান্য অর্থ দিতে পারি না, সময় দিতে পারি না, আমাদের দেশ যে কিরূপ তাহা সন্ধান পূর্ব্বক জানিবার জন্য উৎসাহ অনুভব করি না।”

* * * *

“ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলি করুণস্বরে বীণা বাজাইতেছেন, এ কথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র—কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানা পুকুরের ধারে ম্যালেরিয়াজীর্ণ প্লীহা রোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা। যে ভারতমাতা ব্যাস-বশিষ্ট-বিশ্বামিত্রের তপোবনে শমীবৃক্ষমূলে আলবালে জলসেচন করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে করজোড়ে প্রণাম করিলেই যথেষ্ট কিন্তু আমাদের ঘরের পাশে যে জীর্ণচীরধারিণী ভারতমাতা ছেলেটাকে ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিখাইয়া কেরানিগিরির বিড়ম্বনার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার জন্য অর্দ্ধাশনে পরের পাকশালে রাঁধিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে ত অমন কেবলমাত্র প্রণাম করিয়া সারা যায় না।”

* * * *

“শুধু বড় জিনিষ কল্পনা করিলেও হইবে না, বড় দান ভিক্ষা

করিলেও হইবে না এবং ছোট মুখে বড় কথা বলিলেও হইবে না, দ্বারের পার্শ্বে নিতান্ত ছোট কাজ সুরু করিতে হইবে। বিলাতের প্রাসাদে গিয়া রোদন করিলে হইবে না, স্বদেশের ক্ষেত্রে বসিয়া কণ্টক উৎপাটন করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের শক্তির চেষ্টা হইবে—সেই শক্তির চেষ্টা মাত্রেই স্বাধীনতা, এবং স্বাধীনতা মাত্রেই আনন্দ।” (বঙ্গদর্শন, ১৩১২-বৈশাখ)

পশুত্ব ঘুচিয়ে মানুষকে সত্যিকার মনুষ্যত্বে উন্নীত করবার জন্যেই শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন। সেই শিক্ষার ভার যদি গবর্ণমেণ্টের সম্মতির উপরই নিবদ্ধ থাকে তা হলে হাজার সিনেট-সিণ্ডিকেট আমাদের হাতে এলেও আমরা মানুষের মধ্যে সত্যিকার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতার চিন্তাধারা বিস্তার করতে পারব না। শিক্ষাসম্মতির ভার সরকারের হাতে রাখার উদ্দেশ্যই হচ্ছে দেশবাসীকে পরের হুকুম মেনে প্রতিবাদহীন পরের কাজের সাহায্যকারী হবার মত ক’রে তৈরি করা। আর যদি দেশবাসী, স্বাতন্ত্র্য চিন্তাধারা, আত্মনির্ভরতা ও স্বাধীন অনুসন্ধিৎসা শিক্ষা করবার সুযোগ-সুবিধে তার ভিতর দিয়ে পায় তবে যে সরকারের বিরাট রাজ্য চালাবার মেশিন-রূপী যথেচ্ছ আজ্ঞাবহ কেরাণীকুলের অভাব হয়ে শাসননীতির গোড়ায় শৃঙ্খলার হানি ঘটবে। যতদিন সরকারী সম্মতির অধীনতা হতে এ সমস্ত সভা-সমিতি ও সিনেট-সিণ্ডিকেটকে উদ্ধার ক’রে দেশবাসীর সম্মতিকে উচ্চ স্থান দেওয়া না যাবে এবং গবর্ণমেণ্টকে দেশবাসীর নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থিত বিষয়ের বিস্তারের কর্ম্মে নিয়োজিত করা না যাবে, ততদিন এদেশের শিক্ষা শুধু সুদূর য়ুরোপীয় রাজবংশের মঙ্গলের অনুকূলেই চলতে থাকবে। গবর্ণমেণ্টের শাসননীতিই হচ্ছে

এ দেশের লোক দিয়ে এ দেশের মঙ্গল ধ্বংস করবার প্রশস্ত তৈরি রাস্তা, এবং যে ইংরেজ এ রাস্তা গঠনে খুব পটু সে-ই হচ্চে য়ুরোপীয় সভ্যতায় ও শাসনে বড় পলিটিসিয়ন। অতএব আমাদের অর্থ, স্বাস্থ্য ও চরিত্র, সকল দিক দিয়ে বাঁচতে হ'লে এই শিক্ষাসংস্কারের যে কতখানি প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ সে বিষয় বলেচেন—

"নিজে চিন্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ করিবে, এমনতর মানুষ তৈরি করিবার প্রণালী এক, আর পরের হুকুম মানিয়া চলিবে, পরের মতের প্রতিবাদ করিবে না, ও পরের কাজের জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র, এমন মানুষ তৈরির বিধান অন্যরূপ। আমরা স্বভাবত স্বজাতিকে স্বাতন্ত্র্যের জন্য প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিব, সে কথা বলাই বাহুল্য। ইংলণ্ডে যখন সুদিন ছিল, তখন ইংলণ্ডও কোনো জাতিসম্বন্ধেই এই আদর্শে বাধা দিত না—ভারতবর্ষের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে মেকলের মন্তব্য তাহার প্রমাণ। এখন কালের পরিবর্ত্তন হইয়াছে—এই জন্যই শিক্ষার আদর্শ লইয়া কর্ত্তৃপক্ষদের সঙ্গে স্বদেশভক্তদের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে,—এখন বিদ্যাশিক্ষাকে যেমন করিয়া হউক নিজের হাতে গ্রহণ করিতেই হইবে।

গবর্ণমেন্ট-প্রতিষ্ঠিত সিনেটে, সিণ্ডিকেটে বাঙালী থাকিলেই যে বিদ্যাশিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে রহিল, তাহা আমি মনে করি না। গবর্ণমেণ্টের আমাদের কাছে জবাবদিহি না থাকিয়া দেশের লোকের কাছে জবাবদিহি থাকা চাই। আমরা গবর্ণমেণ্টের সম্মতির অধীনে যখন বাহ্য স্বাতন্ত্র্যের একটা বিড়ম্বনা লাভ করি, তখনি আমাদের বিপদ সবচেয়ে বেশি। তখন প্রসাদ-

লব্ধ সেই মিথ্যা স্বাতন্ত্র্যের মূল্য যাহা দিতে হয়, তাহাতে মাথা বিকাইয়া যায়। বিশেষত দেশীলোককে দিয়াই দেশের মঙ্গল দলন করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে, মনুষ্যত্বের অধিকারের যোগ্য হইবার প্রতি যদি লক্ষ্য রাখি, তবে শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য চেষ্টার দিন আসিয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশের লোককে শিশুকাল হইতে মানুষ করিবার সদুপায় যদি নিজে উদ্ভাবন এবং তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি, তবে আমরা সর্ব্বপ্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইব—অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, বুদ্ধিতে মরিব, চরিত্রে মরিব—ইহা নিশ্চয়। বস্তুত আমরা প্রত্যহই মরিতেছি অথচ তাহার প্রতিকারের উপযুক্ত চেষ্টামাত্র করিতেছি না, এই যে নিবিড় মোহাবৃত নিরুদ্যম ও চরিত্রবিকার—বাল্যকাল হইতে প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত কোনো অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ইহা নিবারণের কোনো উপায় নাই।" (শিক্ষা, ১৩১৩)

এই শিক্ষার সংস্কার ক'রতে হ'লে শুধু খেয়ালের বশে দু-একটা কিছু নাড়-চাড় করলেই সংস্কার হবে না। খুব চিন্তা ক'রে দেখতে হবে কোন্ কোন্ নিয়ম-নীতি আমাদের ঘাড়ে ভূতের মত চেপে বসেচে, তাকে ঝেড়ে ফেলে সোজা ও শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে। এই যে বর্ত্তমান শিক্ষায় আমাদের ছেলেরা স্কুলে যা পড়ে তা পরীক্ষা পাসের জন্যে মস্তিষ্ককে গুদামখানা ক'রে, তাতে যেন ঠেসেঠুসে বস্তাবন্দী ক'রে রাখতে পারলেই তাদের সাফল্যের সূচনা হয়। এই প্রাণহীন শিক্ষার কোন মূল্য নেই। পরিণামে ছেলেরা এর মধ্যে দেখতে পায়, গার্হস্থ্য জীবনের প্রত্যেক দিনের কার্য্যকলাপে, আচার-ব্যবহারে ও সভ্যতায়-সম্পদে তাদের কিছুই ছাপ পড়চে না, জীবনের

দুঃখ কিছুতেই আর ঘোচে না। শিক্ষা-ব্যবসায়ের বাজারে তাদের গুদামজাত মাল যাচাই হ'লে হয়ত বা তারা সার্টিফিকেটে প্রশংসা পেল, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে এসেই দেখে মানবজীবনের দীর্ঘদিনের একটা বিরাট ফাঁকি তাদের প্রতি করুণ ব্যঙ্গ করুচে। তাদের মন চায় এক, আর সার্টিফিকেট বলে তা' করতে দেব না।

আর এক দিক দিয়ে ছেলেদের কাছে, গৃহের ও স্বজনবর্গের আবহাওয়াবর্জ্জিত কয়েক ঘণ্টা স্কুলগৃহে কাল কাটান, একটি কারাবাস বলে মনে না হয়ে পারে না। তাই দেখা যায়, স্কুল-ছুটির ঘণ্টাখানেক পূর্ব্ব হতেই ছেলেদের মনে একটা বন্ধনমুক্তির উৎকণ্ঠা জেগে ওঠে, আর ছুটির সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তির আনন্দে সবাই যেন উৎফুল্ল হয়। এই উৎকট শিক্ষানীতি মানুষের মনকে দিনে দিনে যে কোন্ অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে টেনে নিয়ে চলেচে, সে কথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষাবিভ্রাটজনিত নিদারুণ ব্যথায় বহুবার বহুস্থানে এ বিষয় আলোচনা ক'রে কার্য্যত শান্তিনিকেতনে ভারতীয় শিক্ষা-নীতির আদর্শে বিরাট শিক্ষায়তন গ'ড়ে তুলেচেন। তিনি বার বার প্রকাশ করেছেন যে, এ বিষয়ে বিলাতী নজির ও বিলাতী ধারা আমাদের সইবে না। আমাদের প্রাচীন তপোবন-নীতি মানুষকে শিক্ষাব্যাপারে উন্নততর নীতি দেখিয়ে গিয়েচে। মুক্ত প্রকৃতির কোলে সম্পূর্ণ আত্মীয়তার সঙ্গে শুদ্ধ স্বভাব গড়ে তোলবার জন্যে মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে এর থেকে শ্রেষ্ঠ পন্থা আর কি হ'তে পারে।

এ যুগে বিজ্ঞানের উন্নতি হচ্চে, তাই যদি মানুষগুলিকেও আমরা লোহালক্কড়ের মর্য্যাদাই দিতে থাকি, আর মনুষ্যত্বের মধ্য দিয়ে মুক্ত ও স্বাভাবিক মানুষ গড়তে না পারি তবে আমাদের শিক্ষাদীক্ষা ব্যর্থ হবে।

ভারতীয় শিক্ষাবিধি শিক্ষক ও শিক্ষিতের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনের পথ প্রশস্ত করেই দেবে। তার ফলে ক্রমে সমগ্র ভারতে জাতীয় ঐক্যের সূচনা হবে। মাইনে গোণা শিক্ষকতা এবং অর্থকরী বিদ্যা দান ও বিদ্যার্জ্জনে, য্যালজাব্রা এরিথমেটিকের ফরমুলা কষবার মধ্যেই প্রাণ-সম্বন্ধের সংশ্রব থাকে না। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে যে গভীর চিন্তা করেচেন ও তার সমস্যাসমাধানের জন্য শান্তিনিকেতনে বিরাট আয়োজন ক'রে রেখেছেন, তাঁর দেশসেবার পথে যত দিক আছে তার মধ্যে এ অন্যতম। তিনি তাঁর ভাষায় বলেচেন—

"আমাদের এখনকার প্রয়োজন যদি আমরা ঠিক বুঝি তবে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে বিদ্যালয় ঘরের কাজ করিতে পারে; যাহাতে পাঠ্যবিষয়ের বিচিত্রতার সঙ্গে অধ্যাপনার সজীবতা মিশিতে পারে; যাহাতে পুঁথির শিক্ষাদান এবং হৃদয়মনকে গড়িয়া তোলা দুই ভারই বিদ্যালয় গ্রহণ করে। দেখিতে হইবে আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ের চতুর্দ্দিকের যে বিচ্ছেদ, এমন কি, বিরোধ আছে, তাহার দ্বারা যেন ছাত্রদের মন বিক্ষিপ্ত হইয়া না যায় ও এইরূপে বিদ্যাশিক্ষাটা যেন কেবল দিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা মাত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়া বাস্তবিকতা সম্পর্কশূন্য একটা অত্যন্ত গুরুপাক য়্যাবষ্ট্রক্‌ট্ ব্যাপার হইয়া না দাঁড়ায়।

বিদ্যালয়কে ঘর বানাইলে তাহা বোর্ডিং-ইস্কুল-আকার ধারণ করে। এই বোর্ডিং-ইস্কুল বলিতে যে ছবি মনে জাগিয়া উঠে তাহা মনোহর নয়—তাহা বারিক, পাগলাগারদ, হাসপাতাল বা জেলেরই এক গোষ্ঠীভুক্ত।

অতএব বিলাতের নজির একেবারে ছাড়িতে হইবে, কারণ

বিলাতের ইতিহাস, বিলাতের সমাজ আমাদের নহে। আমাদের দেশের লোকের মনকে কোন্ আদর্শ বহুদিন মুগ্ধ করিয়াছে, আমাদের দেশের হৃদয়ে রসসঞ্চার হয় কিসে তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

বুঝিবার বাধা যথেষ্ট আছে। আমরা ইংরেজী স্কুলে পড়িয়াছি, যে দিকে তাকাই ইংরেজের দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সাম্‌নে প্রত্যক্ষ। ইহার আড়ালে, আমাদের দেশের ইতিহাস আমাদের স্বজাতির হৃদয়ে অস্পষ্ট হইয়া আছে। আমরা ন্যাশন্যাল পতাকাটাকে উচ্চে তুলিয়া যখন স্বাধীন চেষ্টায় কাজ করিব বলিয়া কোমর বাঁধিয়া বসি তখনও বিলাতের বেড়ি কোমরবন্ধ হইয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া ফেলে, আমাদিগকে নজিরের বাহিরে নড়িতে দেয় না।

আমাদের একটা মুস্কিল এই যে, আমরা ইংরেজী বিদ্যা ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি সমাজকে, অর্থাৎ সেই বিদ্যা ও বিদ্যালয়কে তাহার যথাস্থানে দেখিতে পাই না। আমরা ইহাকে সজীব লোকালয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া জানি না। এই জন্য সেই বিদ্যালয়ের এ-দেশী প্রতিরূপটিকে কেমন করিয়া আমাদের জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হইবে তাহাই জানি না, অথচ ইহাই জানা সব চেয়ে প্রয়োজনীয়। বিলাতের কোন্ কলেজে কোন্ বই পড়ানো হয় এবং তাহার নিয়ম কি ইহা লইয়া তর্কবিতর্কে কালক্ষেপ করা সময়ের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার নহে।

এ সম্বন্ধে আমাদের হাড়ের মধ্যে একটা অন্ধ সংস্কার প্রবেশ করিয়াছে; যেমন তিব্বতী মনে করে যে, লোক ভাড়া করিয়া তাহাকে দিয়া একটা মন্ত্র লেখা চাকা চালাইলেই পুণ্যলাভ হয়

তেমনি আমরাও মনে করি কোন মতে একটা সভা স্থাপন করিয়া কমিটির দ্বারা যদি সেটা চালাইয়া যাই তবেই আমরা ফললাভ করিব। বস্তুত সেই স্থাপন করাটাই যেন লাভ। আমরা অনেক দিন হইল একটা বিজ্ঞান-সভা স্থাপন করিয়াছি, তাহার পরে বৎসরে বৎসরে বিলাপ করিয়া আসিয়াছি দেশের লোকে বিজ্ঞান শিক্ষায় উদাসীন। কিন্তু একটা বিজ্ঞান-সভা স্থাপন করা এক, আর দেশের লোকের চিত্তকে বিজ্ঞানশিক্ষায় নিবিষ্ট করা আর। সভায় কাঁদিলেই তাহার পরে দেশের লোক বিজ্ঞানী হইয়া উঠিবে এরূপ মনে করা ঘোর কলিযুগের ফল-নিষ্ঠার পরিচয়।

আসল কথা, মানুষের মন পাইতে হইবে, তাহা হইলে যেটুকু আয়োজন করা যায় সেই টুকুই পুরা ফল দেয়, ভারতবর্ষ যখন শিক্ষা দিত তখন মন পাইয়াছিল কি করিয়া সে কথাটা ভাবিয়া দেখা চাই—বিদেশী ইউনিভার্সিটির ক্যালেণ্ডার খুলিয়া তাহার রস বাহির করিবার জন্য তাহাতে পেন্সিলের দাগ দিতে নিষেধ করিব না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বিচারটাও উপেক্ষার বিষয় নহে, কি শিখাইব তাহা ভাবিবার বটে কিন্তু যাহাকে শিখাইব তাহার সমস্ত মনটা কি করিয়া পাওয়া যাইতে পারে সেও কম কথা নয়।"

* * * *

"মন যখন বাড়িতে থাকে তখন তাহার চারিদিকে একটা বৃহৎ অবকাশ থাকা চাই। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই অবকাশ বিশাল ভাবে বিচিত্রভাবে সুন্দরভাবে বিরাজমান। কোনমতে সাড়ে নয়টা-দশটার মধ্যে তাড়াতাড়ি অন্ন গিলিয়া বিদ্যা শিক্ষার হরিণবাড়ির মধ্যে হাজিরা দিয়া কখনই ছেলেদের প্রকৃতি সুস্থ

ভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে না। শিক্ষাকে দেয়াল দিয়া ঘেরিয়া গেট দিয়া রুদ্ধ করিয়া, দরোয়ান দিয়া পাহারা বসাইয়া শাস্তি দ্বারা কণ্টকিত করিয়া, ঘণ্টাদ্বারা তাড়া দিয়া মানবজীবনের আরম্ভে এ কি নিরানন্দের সৃষ্টি করা হইয়াছে! শিশু যে য্যাল্‌জেব্রা না কষিয়াই ইতিহাসের তারিখ মুখস্থ না করিয়াই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে সেজন্য সে কি অপরাধী? তাই সে হতভাগ্যের নিকট হইতে তাহাদের আকাশ-বাতাস তাহাদের আনন্দ-অবকাশ সমস্ত কাড়িয়া লইয়া শিল্পকে সর্ব্ব প্রকারেই তাহাদের পক্ষে শাস্তি করিয়া তুলিতে হইবে? না-জানা হইতে ক্রমে ক্রমে জানিবার আনন্দ পাইবে বলিয়াই কি শিশুরা অশিক্ষিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে না? আমাদের অক্ষমতা ও বর্ব্বরতা বশতঃ জ্ঞানশিক্ষাকে বিশ্বপ্রকৃতির উদার রমণীয় অবকাশের মধ্য দিয়া উন্মেষিত করিয়া তোলাই বিধাতার অভিপ্রায় ছিল—সেই অভিপ্রায় আমরা যে পরিমাণে ব্যর্থ করিতেছি সেই পরিমাণেই ব্যর্থ হইতেছি। হরিণবাড়ির প্রাচীর ভাঙিয়া ফেল,—মাতৃ-গর্ভে দশমাসে পণ্ডিত হইয়া উঠে নাই বলিয়া শিশুদের প্রতি সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান করিয়ো না—তাহাদিগকে দয়া কর।

তাই আমি বলিতেছি, শিক্ষার জন্য এখনও আমাদের বনের প্রয়োজন আছে এবং গুরুগৃহও চাই। বন আমাদের সজীব বাসস্থান এবং গুরু আমাদের সহৃদয় শিক্ষক। এই বনে এই গুরুগৃহে আজও বালকদিগকে ব্রহ্মচর্য্যপালন করিয়া শিক্ষা সমাধা করিতে হইবে। কালে আমাদের অবস্থার যতই পরিবর্ত্তন হইয়া থাক্ এই শিক্ষা নিয়মের উপযোগিতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই, কারণ এ নিয়ম মানবচরিত্রের নিত্য সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

অতএব আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয়—তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জ্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চ্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।

যদি সম্ভব হয় তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক; এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্ররা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুধ ঘি প্রভৃতির জন্য গোরু থাকিবে এবং গোপালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রামকালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।

অনুকূল ঋতুতে বড় বড় ছায়াময় গাছের তলায় ছাত্রদের ক্লাস বসিবে। তাহাদের শিক্ষার কতক অংশ অধ্যাপকের সহিত তরুশ্রেণীর মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে হইবে। সন্ধ্যার অবকাশ তাহারা নক্ষত্রপরিচয়ে, সঙ্গীতচর্চ্চায়, পুরাণকথা ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া যাপন করিবে।

অপরাধ করিলে ছাত্রগণ আমাদের প্রাচীন প্রথা অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত পালন করিবে। শাস্তি পরের নিকট হইতে অপরাধের প্রতিফল, প্রায়শ্চিত্ত নিজের দ্বারা অপরাধের সংশোধন। দণ্ড স্বীকার করা যে নিজেরই কর্ত্তব্য এবং না করিলে যে গ্লানি মোচন হয় না এই শিক্ষা বাল্যকাল হইতেই হওয়া চাই, পরের নিকটে নিজেকে দণ্ডনীয় করা মনুষ্যোচিত নহে।

যদি অভয় পাই তবে এই প্রসঙ্গে সাহসে ভর করিয়া আর একটা কথা বলিয়া রাখি। এই বিদ্যালয়ে বেঞ্চী টেবিল চৌকির প্রয়োজন নাই। আমি ইংরেজী সামগ্রীর বিরুদ্ধে গোঁড়ামি করিয়া এই কথা বলিতেছি—এমন যেন কেহ মনে না করেন। আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের বিদ্যালয়ে অনাবশ্যককে খর্ব্ব করিবার একটা আদর্শ সর্ব্বপ্রকারে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হইবে। চৌকি টেবিল ডেস্ক সকল মানুষের সকল সময় জোটা সহজ নহে, কিন্তু ভূমিতল কেহ কাড়িয়া লইবে না। চৌকি টেবিলে সত্য সত্যই ভূমিতলকে কাড়িয়া লয়। এমন দশা ঘটে যে, ভূমিতল ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলে সুখ পাই না, সুবিধা হয় না। ইহা একটা প্রকাণ্ড ক্ষতি। আমাদের দেশ শীতের দেশ নহে, আমাদের বেশভূষা এমন নয় যে, আমরা নীচে বসিতে পারি না, অথচ পর-দেশের অভ্যাসে আমরা আসবাবের বাহুল্য সৃষ্টি করিয়া কষ্ট বাড়াইতেছি। অনাবশ্যককে যে পরিমাণে অত্যাবশ্যক করিয়া তুলিব সেই পরিমাণে আমাদের শক্তির অপব্যয় ঘটিবে। অথচ ধনী য়ুরোপের মত আমাদের সম্বল নাই; তাহার পক্ষে যাহা সহজ আমাদের পক্ষে তাহা ভার। কোন একটা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে গেলেই গোড়াতে ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্রের হিসাব খতাইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতে হয়। এই হিসাবের মধ্যে অনাবশ্যকের দৌরাত্ম্য বারো আনা। আমরা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারি না, আমরা মাটির ঘরে কাজ আরম্ভ করিব, আমরা নীচে আসন পাতিয়া সভা করিব। একথা বলিতে পারিলে আমাদের অর্দ্ধেক ভার লাঘব হইয়া যায় অথচ কাজের বিশেষ তারতম্য হয় না। যে দেশে শক্তির সীমা নাই,

যে দেশে ধন কানায় কানায় ভরিয়া উপচিয়া পড়িতেছে সেই দেশের আদর্শে সমস্ত কাজের পত্তন না করিলে আমাদের লজ্জা দূর হয় না, আমাদের কল্পনা তৃপ্ত হয় না। ইহাতে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির অধিকাংশই আয়োজনে নিঃশেষিত হইয়া যায়, আসল জিনিষকে খোরাক জোগাইতে পারি না। যতদিন মেঝেতে খড়ি পাতিয়া হাত পাকাইয়াছি ততদিন পাঠশালা স্থাপন করিতে আমাদের ভাবনা ছিল না। এখন বাজারে শ্লেট পেন্সিলের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, কিন্তু পাঠশালা হওয়াই মুস্কিল। সকল দিকেই ইহা দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে আয়োজন যখন অল্প ছিল—সামাজিকতা অধিক ছিল; এখন আয়োজন বাড়িয়া চলিয়াছে এবং সামাজিকতায় ভাঁটা পড়িতেছে। আমাদের দেশে একদিন ছিল যখন আস্বাবকে আমরা ঐশ্বর্য্য বলিতাম কিন্তু সভ্যতা বলিতাম না; কারণ তখন দেশে যাঁহারা সভ্যতার ভাণ্ডারী ছিলেন—তাহাদের ভাণ্ডারে আসবাবের প্রাচুর্য্য ছিল না। তাঁহারা দারিদ্র্যকে সুভদ্র করিয়া সমস্ত দেশকে সুস্থ স্নিগ্ধ রাখিয়াছিলেন। অন্ততঃ শিক্ষার দিনে যদি আমরা এই আদর্শে মানুষ হইতে পারি তবে আর কিছু না হউক হাতে আমরা কতকগুলি ক্ষমতা লাভ করি—মাটিতে বসিবার ক্ষমতা, মোটা পরিবার মোটা খাইবার ক্ষমতা। এগুলি কম ক্ষমতা নহে, এবং ইহা সাধনার অপেক্ষা রাখে। সুগমতা সরলতা, সহজতাই যথার্থ সভ্যতা,—বহু আয়োজনের জটিল বর্ব্বরতা, বস্তুত তাহা গলদ্ ঘর্ম্ম অক্ষমতার স্তূপকার জঞ্জাল! কতকগুলা জড়বস্তুর অভাবে মনুষ্যত্বের সম্ভ্রম যে নষ্ট হয় না, বরঞ্চ অধিকাংশ স্থলেই স্বাভাবিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, এ শিক্ষা শিশুকাল হইতে

বিদ্যালয়ে লাভ করিতে হইবে—নিষ্ফল উপদেশের দ্বারা নহে, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা। এই নিতান্ত সহজ কথাকে সকল প্রকার সাক্ষাৎ ভাবে ছেলেদের কাছে স্বাভাবিক করিয়া দিতে হইবে। এ শিক্ষা নহিলে শুধু যে আমরা নিজের হাত-পা'কে, ঘরের মেঝেকে, মাটিকে অবজ্ঞা করিতে অভ্যস্ত হইব তাহা নহে, আমাদের পিতা পিতামহকে ঘৃণা করিব এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের সাধনার মাহাত্ম্য যথার্থভাবে অনুভব করিতেই পারিব না।

এইখানে কথা উঠিবে, বাহিরের চিকনচাকনকে যদি তুমি খাতির করিতে না চাও তবে ভিতরের জিনিষটাকে বিশেষ ভাবে মূল্যবান করিয়া তুলিতে হইবে—সে মূল্য দিবার সাধ্য কি আমাদের আছে? প্রথমেই জ্ঞানশিক্ষার আশ্রম স্থাপন করিতে হইলে গুরুর প্রয়োজন। শিক্ষক কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই জোটে কিন্তু গুরু ত ফরমাস দিলে পাওয়া যায় না।" (শিক্ষা, ১৩১৩)

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংশ্রবে থেকে থেকে আমরা আমাদের নিজকে একেবারে ভুলে যেতে বসেচি। একদিক দিয়ে তাতে যেন আমাদের দম বন্ধ হয়ে যাবার জো হয়েচে। যতই দিন যাচ্ছে ততই সভ্যতার জটিলতা এত গুরুতর হয়ে উঠচে যে, নানা ফ্যাসানদোরস্ত বিভিন্নতার কোলাহল কর্ম্মক্ষেত্রকে ভীষণ চঞ্চল ও ক্ষুব্ধ ক'রে তুলেচে। মানুষে মানুষে কাজ ক'রে যায়,—সেই কাজের জন্যে এমন একটা সৃষ্টিছাড়া অভ্যস্ত মনের জোগাড় ক'রে নিতে হয়, যার মধ্যে হৃদয়বৃত্তির মোটেই সংশ্রব নেই। সত্য সেখানে পদে পদে ব্যাহত হচ্চে, সরলতা অশক্তের অপবাতে মরতে বসেচে। মানুষ দল ও নীতির খাতিরে আত্মবিস্মৃত হয়ে অন্য কিছু গ'ড়ে তুলতে বাধ্য হচ্চে,—এ যেন

কৃত্রিমতা, শঠতা ও চালাকীর একটা অস্বাভাবিক জগৎ গড়ে উঠতে সুরু হয়েচে; ইহার ভিতরে না আছে শান্তি, না আছে সুখ না আছে কোন রকম বৃত্তির উৎসাহ; কেবল কলের মত কথা শেখা, কথা তৈরি করা ও কথা বিক্রী করে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাই যেন হচ্চে আমাদের দেশে শিক্ষার একটা পাশ্চাত্য ধারা। এই কুশিক্ষার ফলে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অসন্তুষ্টি যাহা জমে উঠেচে একদিন আবার সময়ের সুবাতাস লেগে হয় ত বা মহাবিপ্লবের আগুন জলে উঠবে ও সমস্ত মেকী ধ্বংস করবার পথে জাতি আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে বিশ্বে নূতন জীবন ঘোষণা করবে। সে জন্যে হয় ত বা কোন মহাপুরুষের প্রয়োজনও হতে পারে। এই মানব-মনের সঙ্গে বাহিরের যে একটা বিরোধ সুরু হয়েচে তা পশ্চিমকেও বিষাক্ত কম করেনি। সেইখানেই এই বিষবৃক্ষের মূল। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ক'রে তার সমাধানের জন্যে ছাত্রগণকে সর্ব্বপ্রযত্নে প্রথমেই সত্যিকার জ্ঞানার্জ্জনের পথে চলতে উপদেশ দিয়ে বলেচেন—

"সভ্যতার জটিল অবস্থায় দেখা যায়, মতের বহুতর স্তর জমিয়া গেছে। কোনোটা চর্চ্চের মত, চর্চ্চার মত নহে, কোনোটা সভার মত, ঘরের মত নহে; কোনটা দলের মত অন্তরের মত, নহে; কোনো মতে চোখ দিয়া জল বাহির হয়, পকেট হইতে টাকা বাহির হয় না; কোন মতে টাকাও বাহির হয়, কাজও চলে—কিন্তু হৃদয়ে তাহার স্থান নাই, ফ্যাশানে তাহার প্রতিষ্ঠা। এই সকলে অবিশ্রাম উৎপন্ন ভূরি ভূরি সত্যবিকারের মাঝখানে পড়িয়া মানুষের মন সত্য মতকেও অবিচলিত সত্যরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্য তাহার আচরণ সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে সত্য

হইতে পারে না। সে সরলভাবে আপন শক্তি ও প্রকৃতি অনুযায়ী কোনো পন্থা নির্ব্বাচন করিবার অবকাশ না পাইয়া বিভ্রান্তভাবে দশের কথার পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে, অবশেষে কাজের বেলায় তাহার প্রকৃতির মধ্যে বিরোধ বাধিয়া যায়। সে যদি নিজের স্বভাবকে নিজে পাইত, তবে সেই স্বভাবের ভিতর দিয়া যাহা কিছু পাইত, তাহা ছোট হউক, বড় হউক, খাঁটি জিনিষ হইত। তাহা তাহাকে সম্পূর্ণ বল দিত, সম্পূর্ণ আশ্রয় দিত; সে তাহাকে সর্ব্বতোভাবে কাজে না খাটাইয়া থাকিতে পারিত না। এখন তাহাকে গোলেমালে পড়িয়া পুঁথির মত, মুখের মত, সভার মত, দলের মত লইয়া, ধ্রুব লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কেবল বিস্তর কথা আওড়াইয়া বেড়াইতে হয়। সেই কথা-আওড়াইয়া-বেড়ানকে সে হিতকর্ম্ম বলিয়া মনে করে; সে জন্য সে বেতন পায়; তাহা বেচিয়া সে লাভ করে, এই সকল কথায় একটুখানি এদিক ওদিক লইয়া সে অন্য সম্প্রদায়, অন্য জাতিকে হেয় এবং নিজের জাতি ও দলকে শ্রদ্ধেয় বলিয়া প্রচার করে।

মানুষের মনের চারিদিকে এই যে অতি-নিবিড় পুঁথির অরণ্যে বুলির বোল ধরিয়াছে, ইহার মোদোগন্ধে আমাদিগকে মাতাল করিতেছে, শাখা হইতে শাখান্তরে কেবলি চঞ্চল করিয়া মারিতেছে, কিন্তু যথার্থ আনন্দ, গভীর তৃপ্তি দিতেছে না। নানা প্রকার বিদ্রোহ ও মনোবিকার উৎপন্ন করিতেছে।"

* * * *

"জঙ্গলের ভিতর দিয়া পথ বাহির করিয়া, এই রাশীকৃত পুঁথি ও বচনের আবরণ ভেদ করিয়া, সমাজের মধ্যে, মানুষের মনের মধ্যে স্বভাবের বাতাস ও আলোক আনিবার জন্য মহাপুরুষ এবং হয় ত মহা বিপ্লবের প্রয়োজন হইবে। অত্যন্ত সহজ কথা, অত্যন্ত সরল সত্যকে হয়ত রক্তসমুদ্র পাড়ি দিয়া আসিতে হইবে। যাহা আকাশের মত ব্যাপক, যাহা বাতাসের মত মূল্যহীন তাহাকে কিনিয়া উপার্জ্জন করিয়া লইতে হয় ত প্রাণ দিতে হইবে। য়ুরোপের মনোরাজ্যে ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের অশান্তি মাঝে মাঝে প্রায়ই দেখা দিতেছে; স্বভাবের সঙ্গে জীবনের, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির প্রকাণ্ড অসামঞ্জস্যই ইহার কারণ।

কিন্তু য়ুরোপের এই বিকৃতি কেবল অনুকরণের দ্বারা, কেবল ছোঁয়াচ লাগিয়া আমরা পাইতেছি। ইহা আমাদের দেশজ নহে, আমরা শিশুকাল হইতে বিলাতী বই মুখস্থ করিতে লাগিয়া গেছি—যাহা আবর্জ্জনা, তাহাও লাভ মনে করিয়া লইতেছি। আমরা যে সকল বিদেশী বুলি সর্ব্বদাই অসন্দিগ্ধ মনে পরমশ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করিয়া চলিতেছি, জানি না, তাহার প্রত্যেকটিকে অবিশ্বাসের সহিত আদি সত্যের নিকষপাথরে ঘষিয়া যাচাই করিয়া লওয়া চাই—তাহার বারো আনা কেবল পুঁথির সৃষ্টি, কেবল তাহারা মুখে মুখেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, দশজনে পরস্পরের অনুকরণ করিয়া বলিতেছে বলিয়া আর দশজনে তাহাকে ধ্রুবসত্য বলিয়া গণ্য করিতেছে। আমরাও সেই সকল বাঁধিগৎ এমন করিয়া ব্যবহার করিতেছি, যেন তাহার সত্য আমরা আবিষ্কার করিয়াছি—যেন তাহা বিদেশী স্কুল মাষ্টারের আবৃত্তির জড় প্রতিধ্বনি মাত্র নহে।"

* * * *

"কোন প্রীতিই সম্পূর্ণ অকৃত্রিম ও পরিপক্ক হইতেই পারে না,—যদি তাহা প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হয়। ভালবাসা অক্লান্ত যত্নে জানিতে ইচ্ছা করে এবং জানা হইলে ভালবাসা আরো সত্য ও সুগভীর হয়। আমাদের স্বদেশপ্রেমের সেই ভিত্তির অভাব আছে এবং আমাদের মনে সেই ভিত্তি রচনার জন্য যদি দুর্নিবার আগ্রহ উপস্থিত না হয়, তবে যেন আমরা স্বদেশপ্রেমের অভিমান না করি। যদি এই প্রেমের অভিমানী হইবার প্রকৃত অধিকার আমরা লাভ না করিতে পারি, তবে স্বদেশ আমাদের স্বদেশ নহে। জ্ঞানের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, সেবার দ্বারা, পরিপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারাই অধিকার লাভ করা যায়। জগতে যে জাতি দেশকে ভালবাসে সে অনুরাগের সহিত স্বদেশের সমস্ত সন্ধান নিজে রাখে, পরের পুঁথির প্রত্যাশায় তাকাইয়া থাকে না, স্বদেশের সেবা যথাসাধ্য নিজে করে, কেবল পরের কর্ত্তব্যবোধকে জাগ্রত করিবার উপায় সন্ধান করে না, এবং দেশের সমস্ত সম্পৎকে নিজের সম্পূর্ণ ব্যবহারে আনিতে চেষ্টা করে,—বিদেশী ব্যবসায়ীর অশুভাগমনের প্রতীক্ষায় নিজেকে পথের কাঙাল করিয়া রাখে না। তাই আজ আমি আমাদের ছাত্রগণকে বলিতেছি, দেশের উপরে সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বপ্রযত্নে জ্ঞানের অধিকার বিস্তার কর, তারপরে প্রেমের এবং কর্ম্মের অধিকার সহজে প্রশস্ত হইতে থাকিবে।" (শিক্ষা, ১৩১৩)

এম্-এ, বি-এ পাশের জন্যে ও ডিগ্রী পাশের জন্যে যে একটা বিষম মৌতাত এসে দেশের যুবকযুবতীদের অর্থ, স্বাস্থ্য ও আয়ু নষ্ট ক'রে জীবনকে সর্ব্বস্বান্ত ক'রে দিচ্ছে ও ব্যর্থ কৃত্রিম গৌরবের অন্ধকার

গহ্বরের দিকে টেনে নিয়ে চলেচে এবং সত্যিকার কাজের মানুষ এ সমস্ত পাস করাদের মধ্যে শত করা একজনও গজিয়ে উঠচে না সেজন্যে রবীন্দ্রনাথ এই ডিগ্রী ও পাসের ব্যবস্থাকে শিক্ষাব্যাপারে অবান্তর বলে উল্লেখ করেচেন। বিশেষতঃ মেয়েদের সুকুমারী জীবনের পক্ষে দেহ ও মনের দিক দিয়ে তা যে ভীষণ ভয়াবহ বিঘ্নকর সে বিষয় তিনি কঠোর ভাবে আলোচনা করেচেন। তিনি শিক্ষার খুবই পক্ষপাতী, কিন্তু তার দুর্গতি ও দুর্গতির কারণকে মনুষ্যত্ব বিস্তারের পরিপন্থী মনে করেন। শিক্ষার আকাঙ্ক্ষাকে অতিক্রম ক'রে যখন পরীক্ষা পাসের ও ডিগ্রী লাভের গৌরব-আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে দেখা দেয়, তখন শিক্ষার আদর্শ ছোট হয়ে পড়ে ও তা দ্বারা সবল মন তৈরি হয়ে ওঠে না বরং পরীক্ষারূপী বাজী জিৎবার উৎসাহে অপর্য্যাপ্ত খাটুনি দ্বারা শরীরও মন ভেঙেই পড়ে। তার দ্বারা সহাধ্যায়ীদিগকে জয় করা ও ডিগ্রীলাভ হয় ত বা হয়, কিন্তু তাতে নিজের মনের পশুকে জয় করার শিক্ষা লাভ হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বলেছেন—

"আমাদের মেয়েরাও আজকাল একজামিন পাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বাঙ্গালী জাতটাই কি একেবারে একজামিন দিতে দিতে জগৎসংসার হইতে 'পাস' হইয়া যাইবে? পাসকরা ছেলেদেরই শরীর ত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। মেয়েদের মধ্যেও কি শীর্ণ শরীর, জীর্ণ মস্তিষ্ক, রুগ্ন পাকযন্ত্র প্রচলিত হইবে? মেয়েদেরও কি চোখে চস্‌মা, পকেটে কুইনিন্, উদরে দাওয়াইখানার প্রাদুর্ভাব হইবে? পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আশায় ছয়মাস ধরিয়া উন্মাদ উত্তেজনা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে হৃদয়বিদারক লজ্জা ও নিরাশা ইহা কি আমাদের দেশের সুকুমারী বালিকাদেরও আয়ুক্ষয়

করিতে থাকিবে? পরীক্ষাশালায় প্রবেশ করিবার সময় বড় বড় জোয়ান বালকের যে হৃৎকম্প উপস্থিত হয় তাহাতেই তাহাদের দশ বৎসর পরমায়ু হ্রাস হইয়া যায় তবে মেয়েদের দশা কি হইবে? মেয়েরা যে বিদ্যাশিক্ষা করিবে তাহার একটা অর্থ বুঝিতে পারি— কিন্তু মেয়েরা কেন যে পরীক্ষা দিবে তাহার কোন অর্থ বুঝিতে পারি না। এমন সময়ে তাহাদিগকে এমন সৎশিক্ষা দাও যাহাতে জ্ঞানের প্রতি তাহাদের স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মে। আয়ুক্ষয়কর এবং কোমল হৃদয়ের বিকারজনক প্রকাশ্য গৌরব লাভের উত্তেজনায় তাহাদিগকে নাকে চোখে জ্ঞানশিখিতে প্রবৃত্ত করান ভাল বোধ হয় না। পরীক্ষা দেওয়ার গৌরব-লোভ এক প্রকার জুয়াখেলা। ইহা হৃদয়ের অস্বাভাবিক উত্থান-পতনের কারণ। প্রকাশ্য গৌরবলাভের জন্য প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে যোঝাযুঝি করিতে দণ্ডায়মান হইলে অধিকাংশস্থলেই হৃদয়ের দুর্মূল্য সৌকুমার্য্য দূর হইয়া যায়। কেবল তাহাই নয়, জ্ঞানলাভ গৌণ এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। পরীক্ষায় অপকার সম্পূর্ণ পাওয়া যায় অথচ জ্ঞানলাভের সম্পূর্ণ উপকার পাওয়া যায় না। আমাদের বাংলা দেশটা একটা প্রকাণ্ড ইউনিভার্সিটি-চাপা পড়িয়া মরিবার উদ্যোগ হইয়াছে। এস না কেন আমরা এম্-এ, বি-এ ডিগ্রিগুলি গলায় বাঁধিয়া মেয়েপুরুষে মিলিয়া বঙ্গোপসাগরের জলে ডুবিয়া মরি? সে বড় গৌরবের কথা হইবে। আমেরিকা ও য়ুরোপ হাততালি দিতে থাকিবে।” (বালক, ১২৯২)

যে-শিক্ষা শিক্ষিতের মনে লোকহিতের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে না দেয় তাহা যথার্থ শিক্ষা নহে। আমাদের মধ্যে দেখা যায় বহু লোকই কি

একটা ইচ্ছা হতে পরোপকার করবার জন্যে চেষ্টা ক’রে থাকেন। কিন্তু আবার অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় শিক্ষিত মনের অভাবে সেই পরোপকারও অবশেষে মনের একটা নিকৃষ্ট বৃত্তির বিকার হিসাবে প্রকাশ পায়। কোন কোন ক্ষেত্রে উপকার উপকারীর কাছ থেকে উপকৃতের পাতে ভিক্ষার মত বর্ষিত হয়, কোথাও বা ঋণরূপে এসে পড়ে। উপকারীর মনেও একটা আত্মাভিমান থাকে যে, একটা উপকার করা যখন হয়েচে তখন উপকৃত লোকটি আর যায় কোথা। তাকে নিশ্চয়ই ঋণে বেঁধে ফেলেচি। সময়ে অসময়ে এর বিনিময়ে কত লাভই হবে, অথবা যদি লাভ নাই-বা হয় তবু ত লোকটির উপকার করেচি, সে নিশ্চয়ই আমার কাছে মাথা নত ক’রে থাকবে। এরূপ মহা আসক্তিপূর্ণ উপকারের ধারাও উপকারীর মনোবৃত্তি, উপকারী ও উপকৃতের মধ্যে একটা নিদারুণ বৈষম্যের সৃষ্টি করে। এই জন্যে অনেক সময়ে ঐ উপকার-ব্যবসায়ী কুসীদজীবীর কাছে উপকৃত ব্যক্তি উপকার-প্রত্যাশার জন্যে নিজকে ধিক্কৃত করে ও এই অতর্কিত বিপদপাতের জন্যে অনুশোচনার তীব্র দহনে দগ্ধ হয়। খত পত্রে টাকা পয়সা ঋণ নেওয়া বরং ভাল, কিন্তু এই রকম মানুষের মনকে মানুষের কাছে কথায় কথায় ঋণী ক’রে দেওয়া বা বিকিয়ে দেওয়া মনুষ্যত্বের শিক্ষায় অসহন জঘন্য বৃত্তি। যে উপকারে দয়া ও প্রীতি নেই, সেই উপকার আত্মীয়বোধ হ’তে অনুপ্রেরিত হয় না, তার মধ্যেই বৈষম্য দেখা যায়। আর যে শিক্ষিত মন উপকার করাকেই তার সময়োচিত কর্ত্তব্য ব’লে অনাসক্তভাবে দয়া ও প্রীতিতে উপকৃতের প্রাণে পরম আত্মীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলে, সে চিরদিন উপকৃতের আত্মীয় ও বন্ধু হয়েই থাকে। প্রতিদানকে বড় ক’রে চাইলে প্রাণের মহিমা ছোট হয়ে পড়ে। তাই রবীন্দ্রনাথ লোকহিত সম্বন্ধে বলেচেন—

"আমরা পরের উপকার করিব মনে করিলেই উপকার করিতে পারি না। উপকার করিবার অধিকার থাকা চাই। যে বড় সে ছোটর অপকার অতি সহজে করিতে পারে, কিন্তু ছোটর উপকার করিতে হইলে কেবল বড় হইলে চলিবে না, ছোট হইতে হইবে। মানুষ কোন দিন কোন যথার্থ হিতকে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিবে না, ঋণরূপেও না, কেবল মাত্র প্রাপ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিবে।

কিন্তু আমরা লোকহিতের জন্য যখন মাতি তখন অনেক স্থলে সেই মত্ততার মূলে একটি আত্মাভিমানের মদ থাকে। লোক-সাধারণের চেয়ে সকল বিষয়ে বড় এই কথাটাই রাজকীয় চালে সম্ভোগ করিবার উপায় উহাদের হিত করিবার আয়োজন। এমন স্থলে উহাদেরও অহিত করি, নিজেদেরও হিত করি না।

হিত করিবার একটি মাত্র ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে, সেটি প্রীতি। প্রীতির দানে কোন অপমান নাই। কিন্তু হিতৈষিতার দানে মানুষ অপমানিত হয়। মানুষকে সকলের চেয়ে নত করিবার উপায় তাহার হিত করা অথচ তাহাকে প্রীতি না করা।

একথা অনেক সময়েই শোনা যায় যে, মানুষ স্বভাবতই অকৃতজ্ঞ—যাহার কাছে সে ঋণী তাহাকে পরিহার করিবার জন্য তাহার চেষ্টা। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'—এ উপদেশ পারতপক্ষে কেহ মানে না। তাহার মহাজনটি যে-রাস্তা দিয়া চলে মানুষ সে-রাস্তায় চলা একেবারে ছাড়িয়া দেয়।

ইহার কারণ এ নয় যে,—স্বভাবতই মানুষের মনটা বিকৃত, ইহার কারণ এই যে, মহাজনকে সুদ দিতে হয়; সে সুদ আসলকে ছাড়াইয়া যায়। হিতৈষী যে সুদটি আদায় করে সেটি মানুষের

আত্মসম্মান,—সেটিও লইবে আবার কৃতজ্ঞতাও দাবী করিবে, সে যে শাইলকের বাড়া হইল।

সেইজন্য লোকহিত করায় লোকের বিপদ আছে সে কথা ভুলিলে চলিবে না। লোকের সঙ্গে আপনাকে পৃথক রাখিয়া যদি তাহার হিত করিতে যাই তবে সেই উপদ্রব লোকে সহ্য না করিলেই তাহাদের হিত হইবে।"

(সবুজ পত্র, ১৩২১)

উপসংহার

বর্ত্তমান য়ুরোপ সমগ্র জগতের কাছে একটা অবিশ্বাসের পাত্র হ'য়ে পড়েছে। তাদের বাইবেল, তাদের শাস্ত্রগ্রন্থ ও অন্যান্য বহি পুস্তকের আদর্শ প্রথম প্রথম বিশ্বের একটা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলো তারপরে কার্য্যগতিকে মানুষের সঙ্গে মানুষ যখন বেশী পরিচিত হতে লাগলো তখন য়ুরোপ অন্যদেশের কাছে একেবারে আদর্শবিচ্যুত হয়ে বিপরীতভাবে ধরা পড়ে গেলো। তাদের কথা ও কাজে এত বেশী অমিল যে, তারা আর বিশ্বাসের কোঠায় স্থান পেলো না। ক্রমে ক্রমে পশ্চিমের আত্মরূপ আরো বিশেষভাবে প্রকটিত হ'তে লাগলো ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা-শাসনের কৃত্রিমতার ভিতর দিয়ে। মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তাবোধকে একেবারে ভুলে গিয়ে যখন পশ্চিম প্রাচ্যকে কেবল অর্থসংগ্রহের কামধেনু হিসাবে নিয়ত দোহন করতে সুরু করল ও বাণিজ্যবুদ্ধিকেই বড় ক'রে দেখতে লাগল তখনি প্রাচ্যের শান্তিগৃহ হলো বীভৎস আকারের কর্ম্মকারখানা ও বৈষম্য-কারাগার। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেচেন—

"একথা খুবই সত্য, আমরা, যারা য়ুরোপের বাহিরে আছি, আমাদের সঙ্গে য়ুরোপের প্রধান সম্বন্ধ শোষণসাধনের, exploitation-এর, অর্থাৎ তার প্রবর্ত্তনা আধিভৌতিক, materialistic. প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য, প্রকাণ্ড বাণিজ্য—অপরিমিত তার আয়তন ও ক্ষুধা; তার মধ্যে বাহ্য শক্তির চেহারাই অতিমাত্রায়। এর সংস্পর্শে

আমাদের মানবচিত্ত পীড়িত হয়ে পড়ে; মানুষে মানুষে আত্মীয়তার বন্ধন অনুভব করতে বাধা পাই ব'লেই বাহ্যিক বৈষয়িক স্থূল বন্ধনের কঠোরতাই আমাদের অত্যন্ত পীড়িত করে। এই পীড়া উত্তরোত্তর বেড়ে উঠেছে। আজ সমস্ত এশিয়াতে কোন জাতিই নেই য়ুরোপকে যে ভয় ও সন্দেহের চক্ষে না দেখে। অথচ একদিন ছিল যখন য়ুরোপের আইডিয়ালের দিকটা আমরা তার সাহিত্য প্রভৃতি থেকে লাভ করে মুগ্ধ হয়েছিলুম, আশান্বিত হয়েছিলুম—মনে করেছিলুম, জগতে স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচার করাই বর্ত্তমান য়ুরোপের প্রধান কাজ, কিন্তু ক্রমেই এমন হলো যখন য়ুরোপের বৈষয়িকতার ক্ষেত্র হয়ে উঠল এশিয়া, আফ্রিকা—যেখানে তার প্রধান লক্ষ্য লাভ করা, শাসন করা, বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তার করা;—তখন থেকে এই প্রকাণ্ড মহাদেশগুলি তাদের গুদাম ঘর, তাদের আফিস, তাদের পুলিশের থানা ও সৈনিকের ব্যারাক বিস্তার করতে করতে চলেছে, মানব-সম্বন্ধ সম্পূর্ণ গৌণ হয়ে পড়েচে।"

(প্রবাসী, ১৩৩৫)

অবিশ্বাসজনিত বৈষম্যবোধ যখন বেড়ে চলতে লাগলো তখন ইংরেজ ভারতবর্ষের প্রতি জবরদস্ত শাসনের গুরুদণ্ড উত্তোলন করলেন। তখন দেখা গেলো, প্রাণের মাহাত্ম্য শাসকসম্প্রদায় এত বেশী ক'রে বুঝতে লাগলেন যে, প্রাণকে নিরাপদ করবার জন্যে আইনের দোহাই দিয়ে প্রাণ হনন করতে মোটেই আর কুণ্ঠিত হন না, কিন্তু ইংরেজহত্যাকারীকে ইংরেজবিচারকের এজলাসে বিচারের ফলে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলতে দেখা যায় না। সেখানে শাস্তি যা একটা কিছু সামান্য হয়, তার প্রচার হয় তিলে তাল হয়ে আর তত্রত্য লোকমতের

বিরুদ্ধে যা-তা করতে ইংরেজ সাহস করে না। কর্ত্তাদের যত বিচারের প্রহসন আর আইনের কৃতিত্ব ভারতবর্ষেই জাহির হয় ভারতবাসীর পরাধীন প্রাণ ব'লে। ইংরেজও ভারতবাসীর প্রাণের মূল্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি—

"প্রাণের মাহাত্ম্য ইংরাজ আমাদের চেয়ে বেশি বোঝে, সে কথা না হয় স্বীকার করিয়াই লওয়া গেল। অতএব সেই ইংরাজ যখন প্রাণ হনন করে, তখন তাহার অপরাধের গুরুত্ব আমাদের চেয়ে বেশি। অথচ দেখিতে পাই দেশীয়কে হত্যা করিয়া কোন ইংরাজ খুনী, ইংরাজ জজ ও ইংরাজ জুরির বিচারে ফাঁসি যায় নাই। প্রাণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আমাদের বোধশক্তি যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ইংরাজ অপরাধী হয়ত তাহার প্রমাণ পায়, কিন্তু সে প্রমাণ দেশীয় লোকদের কাছে কিছু অসম্পূর্ণ বলিয়াই ঠেকে।

এইরূপ বিচার আমাদিগকে দুই দিক্ হইতে আঘাত করে। প্রাণ যা যাবার, সে ত যায়ই, ও দিকে মানও নষ্ট হয়, ইহাতে আমাদের জাতির প্রতি যে অবজ্ঞা প্রকাশ পায়, তাহা আমাদের সকলেরই গায়ে বাজে।

ইংলণ্ডে গ্লোব বলিয়া একটি সংবাদপত্র আছে। সেটা সেখানকার ভদ্রলোকেরই কাগজ—তাহাতে লিখিয়াছে, টমি য়্যাট্‌কিন (অর্থাৎ পল্টনের গোরা) দেশী লোককে মারিয়া ফেলিবে বলিয়া মারে না, কিন্তু মার খাইলেই দেশী লোকগুলা মরিয়া যায়—এইজন্য টমি বেচারার লঘুদণ্ড হইলেই দেশী খবরের কাগজগুলা চীৎকার করিয়া মরে।

টমি য়্যাট্‌কিনের দরদ খুব দেখিতেছি, কিন্তু স্যাঙ্কটিটি

অফ লাইফ্, কোন্‌খানে! যে পাশব আঘাতে আমাদের পীলা ফাটে, এই ভদ্রকাগজের কয় ছত্রের মধ্যেও কি সেই আঘাতেরই বেগ নাই? স্বজাতিকৃত খুনকে কোমল স্নেহের সহিত দেখিয়া হত ব্যক্তির আত্মীয়-সম্প্রদায়ের বিলাপকে যাহারা বিরক্তির সহিত ধিক্কার দেয়, তাহারা কি খুন পোষণ করিতেছে না?"

(ধর্ম্মবোধের দৃষ্টান্ত, ১৩১০)

দেশপ্রীতির চরম পরীক্ষা দেশের জন্যে জীবন দানে, অথবা সুখ-ঐশ্বর্য্যের সম্প্রদানে। রবীন্দ্রনাথের মতে দেশপ্রীতির জলন্ত পরীক্ষার দুইটি দিক আছে, একটি ব্রাহ্মণের মত জীবনের সুখ-সম্পদকে অগ্রাহ্য ক'রে মুক্তির আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠা, আর এক দিক,—ক্ষত্রিয়ের মত মৃত্যুভয়কে অগ্রাহ্য ক'রে পৃথিবীর সুখ-সম্পদের অধিকারী হওয়া। যার মধ্যে ভালবাসা ব'লে কোন জিনিষ আছে সে সেই ভালবাসার অনুপ্রেরণায় নিজকে মরণের দিকে ঠেলে না দিয়ে পারে না। সে যদি নিজকেও ভালবাসে তাহলেও সে নিজের মঙ্গলপথে উন্নততর গতির জন্যে অবশেষে আপনাকে হারিয়ে ফেল্‌তে প্রস্তুত হয়। অতএব তার ভালবাসা যদি দেশের জন্যে থাকে তবে দেশের মঙ্গলের জন্যে আত্মত্যাগ তাকে করতেই হয়। পৃথিবীতে যত জাতি স্বাধীনতার গৌরবে গৌরবান্বিত তাদের সকলকেই এই মরণ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েচে। দেশকে যদি জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দিতে হয় তবে প্রথমেই মনে আসে মানুষের শ্রেষ্ঠ উপাদান প্রাণের কথা। আর যারা প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত বুঝ্‌তে হবে তারা প্রাণবান নয়, জীবন্মৃত। মৃতের কাছে স্বাধীনতার কোন মূল্য নেই, তা' লাভেরও তার কোন অধিকার নেই। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে দেশবাসীকে মৃত্যুভয় থেকে ত্রাণ

করবার জন্যে দেশপ্রীতির দিক দিয়ে আত্মত্যাগের কত বড় প্রয়োজন আছে তাহা জলন্ত ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে বলেচেন—

"মৃত্যু একটা প্রকাণ্ড কালো কঠিন কষ্টি পাথরের মত। ইহারই গায়ে কষিয়া সংসারের সমস্ত খাঁটি সোনার পরীক্ষা হইয়া থাকে।

তুমি দেশকে যথার্থ ভালবাস—তাহার চরম পরীক্ষা, তুমি দেশের জন্য মরিতে পার কি না। তুমি আপনাকে যথার্থ ভালবাস, তাহারো চরম পরীক্ষা আপনার উন্নতির জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করা তোমার পক্ষে সম্ভবপর কি না।

এমন একটা বিশ্বব্যাপী সার্ব্বজনীন ভয় পৃথিবীর মাথার উপরে যদি না ঝুলিত, তবে সত্য-মিথ্যাকে, ছোট-বড়-মাঝারিকে বিশুদ্ধভাবে তুলা করিয়া দেখিবার কোন উপায় থাকিত না।

এই মৃত্যুর তুলায় যে সব জাতির তৌল হইয়া গেছে, তাহারা পাস-মার্কা পাইয়াছে। তাহারা আপনাদিগকে প্রমাণ করিয়াছে, নিজের কাছে ও পরের কাছে তাহাদের আর কিছুতেই কুণ্ঠিত হইবার কোনো কারণ নাই। মৃত্যুর দ্বারা তাহাদের জীবন পরীক্ষিত হইয়া গেছে। ধনীর যথার্থ পরীক্ষা দানে, যাহার যথার্থ প্রাণ আছে, তাহার যথার্থ পরীক্ষা প্রাণ দিবার শক্তিতে। যাহার প্রাণ নাই বলিলেই হয় সেই মরিতে কৃপণতা করে।

যে মরিতে জানে, সুখের অধিকার তাহারই, যে জয় করে ভোগ করা তাহাকেই সাজে। যে-লোক জীবনের সঙ্গে সুখকে, বিলাসকে, দুই হাতে আঁকড়িয়া থাকে, সুখ তাহার সেই ঘৃণিত ক্রীতদাসের কাছে নিজের সমস্ত ভাণ্ডার খুলিয়া দেয় না; তাহাকে

উচ্ছিষ্টমাত্র দিয়া দ্বারে ফেলিয়া রাখে। আর মৃত্যুর আহ্বান মাত্র যাহারা তুড়ি মারিয়া চলিয়া যায়, চিরআদৃত সুখের দিকে একবার পিছন ফিরিয়াও তাকায় না, সুখ তাহাদের চায়, সুখ তাহারাই জানে। যাহারা সবলে ত্যাগ করিতে পারে, তাহারাই প্রবল ভাবে ভোগ করিতে পারে। যাহারা মরিতে জানে না, তাহাদের ভোগ-বিলাসের দীনতা-কৃশতা-ঘৃণ্যতা গাড়িজুড়ি এবং তক্‌মা চাপরাসের দ্বারা ঢাকা পড়ে না। পৃথিবীতে সাতটা আশ্চর্য্য জিনিষ আছে, তেমনি লজ্জার জিনিষ কয়টা আছে, তাহার গণনা হয় নাই—যদি হইত, তবে বাঙালীবাবুর কুসুমকোমল বাবুয়ানা তাহার প্রথমস্থান অধিকার করিত। নির্লজ্জ বাবুকে তাহার বিলাতী দোকানের আরামচৌকি হইতে টানিয়া উৎপাটিত করিতে পারি এমন একটা আকস্মিক দৈবদুর্য্যোগ বিধাতার কাছে প্রার্থনা করি। ত্যাগের বিলাস-বিরল কঠোরতার মধ্যে পৌরুষ আছে। যদি স্বেচ্ছায় তাহা বরণ করি, তবে নিজেকে লজ্জা হইতে বাঁচাইতে পারিব।

এই দুই রাস্তা আছে, এক ক্ষত্রিয়ের রাস্তা আর এক ব্রাহ্মণের রাস্তা। যাহারা মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে পৃথিবীর সুখসম্পদ তাহাদেরি, যাহারা জীবনের সুখকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, তাহাদের আনন্দ মুক্তির। এই দুয়েতেই পৌরুষ।

প্রাণটা দিব এ কথা বলা যেমন শক্ত—সুখটা চাই না এ কথা বলা তাহা হইতে কম শক্ত নয়। পৃথিবীতে যদি মনুষ্যত্বের গৌরবে মাথা তুলিয়া চলিতে চাই, তবে এই দুয়ের একটা কথা যেন বলিতে পারি। হয় বীর্য্যের সঙ্গে বলিতে হইবে—"চাই!" নয় বীর্য্যের সঙ্গে বলিতে হইবে "চাই না!" চাই বলিয়া কাঁদিব

অথচ লইবার শক্তি নাই; চাই না বলিয়া পড়িয়া থাকিব; কারণ চাহিবার উদ্যম নাই; এমন ধিক্কার বহন করিয়াও যাহারা বাঁচে যম তাহাদিগকে নিজগুণে দয়া করিয়া না সরাইয়া লইলে তাহাদের মরণের আর উপায় নাই।"

(বঙ্গদর্শন, ১৩০৯)

বিষয়-নির্ঘণ্ট

বিষয়		পৃষ্ঠা
স্বদেশ	...	২-৬, ২০, ৬৬
সমাজ	...	৪৬-৪৭, ৫৫-৫৭
সভ্যতা	...	৫৮-৫৯, ৭৯-৮০
শিক্ষা	...	৬১-৬৬, ৬৮-৬৯, ৭১-৭৮, ৮০-৮৪
নীতিনিষ্ঠা	...	৭-১৩
তপস্যা	...	১৩-১৪
সংযম	...	৩৯
ত্যাগ	...	৪৫-৪৬
প্রাণশক্তি	...	৪২-৪৩, ৯২-৯৪
পরোপকার	...	৮৬-৮৭
লোকসেবা	...	২৩-২৫
ঐক্য ও সংঘ	...	১৫-২০, ২১-২৩, ২৭-২৮, ৩৮-৩৯
আন্তর্জাতিকতা	...	২৮-৩০
রাজা ও প্রজা	...	৪৮-৪৯
সাম্য ও বৈষম্য	...	৫১-৫৪, ৮৮-৮৯
বিপ্লব	...	২৫-২৬, ৩২-৩৮
বিদেশীয় সমালোচনা	...	৪১-৪৪, ৯০-৯১

টীকা-টিপ্পনী

পৃষ্ঠা মূলশব্দ ব্যাখ্যা

২ বাগীশবর্গ = বক্তারা (শ্লেষোক্তি) যারা কর্ম্ম কম করে ও কথা বেশী বলে।

Agitate = আন্দোলন।

ইল্‌বর্টবিল = লর্ডরিপনের সময় ইল্‌বর্টবিল হইয়াছিল। ইহার মর্ম্ম এই যে, ভারতীয় সিভিলিয়নদিগের এজলাশে ইংরেজ বা বিদেশীয়দিগের বিচার হইবে। বহু ইংরেজ ইল্‌বর্ট বিলের বিরুদ্ধে তখন প্রতিবাদ করিয়াছিল।

লোক্যাল সেল্‌ফ গবর্ণমেণ্ট = স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন।

পলিটিক্যাল = রাজনৈতিক।

এডুকেশন = শিক্ষা।

কনষ্টিটিউসানেল হিষ্টিপড়া ইংরেজি বক্তৃতা = আইন-কানুন ও শাসন-গঠনের ইতিহাসে পঠিত ইংরেজী বক্তৃতা।

৩ ঘরে যাহার হাঁড়ি⋯কিরূপে নিবারণ করিবে = অর্থাৎ তাহার হাতে টাকা না দিয়া তাহার প্রতিকৃতির হাতে টাকার তোড়া আঁকিয়া দিয়া⋯⋯করিবে?

৫ যে কৃষক নাগরিক মহাশয়ের⋯⋯⋯সত্যপীরের গান করিতে আসিয়াছেন = সহরের বক্তার বক্তৃতা অশিক্ষিত কৃষকেরা না বুঝিয়া প্রথমে হা করিয়া শোনে, অনেকক্ষণ শোনার পরে হাই তুলিয়া আলস্যে ঝিমাইয়া পড়ে ও বাড়ীতে গিয়া অবশেষে স্ত্রীর কাছে বক্তৃতার কথা বলিতে গিয়া স্বদেশী সঙ্গীতকে গ্রামের সত্যপীরের গান বলিয়া কোন রকমে বুঝাইয়া দেয়।

পৃষ্ঠা মূলশব্দ ব্যাখ্যা

১০ Sentimental = ভাবপ্রবণ।

২৮ বিশ্বকবি = এখানে বিশ্বকবি বিশ্বস্রষ্টা অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। সৃজনে যিনি আনন্দ দান করেন তাঁহাকে কবি বলা যাইতে পারে।

২৯ টাইম্‌স্ = বিলাতের বিখ্যাত সংবাদপত্র

টাইম্‌স্ অফ্ ইণ্ডিয়া = বিলাতের ও সরকারের গুণকীর্ত্তনকারী একখানি ইংরেজী পত্রিকা।

৪১ আফিসের মধ্যে যন্ত্রারূঢ় দেখিতে থাকি = আফিসের মধ্যে যন্ত্রের মত মনুষ্যত্ববর্জ্জিত হৃদয়হীন অবস্থায় যখন আফিসি নিয়ম দোরস্ত দেখিতে থাকি।

৪৩ সিভিলিয়ন = জজ্, ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতি রাজপুরুষগণ।

৪৯ ল্যাঙ্কশিয়রের = বিলাতের বস্ত্রব্যবসায়ী ল্যাঙ্কশিয়রবাসীদের।

হ্যালিডে রাজা = ব্যাম্‌ফিল্ড্ ফুলার যখন পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাট, হ্যালিডে তখন কলিকাতার পুলিশ কমিশনার। (শাসনে স্বেচ্ছাচারিতার জন্য শ্লেষোক্তি)।

ফুলার রাজা = বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে ফুলার সাহেব ছিলেন পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাট। ১৩১৩ সনের বরিশাল কন্‌ফারেন্স ভাঙিয়া দিবার জন্য ও বন্দেমাতরম্‌ধ্বনি রোধ করিবার জন্য আইন বলে তিনি অত্যাচার চালাইয়াছিলেন। (শাসনে স্বেচ্ছাচারিতার জন্য শ্লেষোক্তি)।

পায়োনিয়র-সম্পাদক রাজা = জাতীয়তাবিদ্বেষী পায়োনিয়র পত্রিকার সম্পাদক যাহা লেখেন বিলাতের লোকেরা

পৃষ্ঠা মূলশব্দ ব্যাখ্যা

ভারত সম্বন্ধে সাধারণতঃ তাহাই ধ্রুব সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। (স্বেচ্ছাচারপ্রচারের জন্য শ্লেষোক্তি)

৫১ সোশ্যালিজম্ = কার্ল মার্কস্ প্রবর্ত্তিত সামাজিকবাদ।

৬১ Law and Order = আইন ও শাসন।

সমবায়নীতি = অনেক লোক একত্র হইয়া নির্দ্দিষ্ট কোন নিয়মের অধীনে কাজ করিবার পন্থা।

৬২ ডেস্কলোকে মনিবের সঙ্গে সাযুজ্যলাভ = লিখিবার ডেস্কের সম্মুখে বসিয়া মনিবের সঙ্গে কেরাণীর সংযোগ বা সহযোগিতা রক্ষা করা (শ্লেষোক্তি)।

সিভিল্ সার্ভিস = আই-সি-এস্ পাস করা রাজপুরুষের চাকুরী।

মিলিটারী = সমরবিভাগ সম্বন্ধীয়।

গবর্ণর = প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা।

ভাইস্‌রয় = ভারতের শাসনকর্ত্তা।

৬৫ প্যাট্রিয়টিজম্ = দেশপ্রীতি।

সিনেট সিণ্ডিকেট = বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের সভা।

৬৮ পলিটিসিয়ন = রাজনীতিজ্ঞ।

৬৯ মেকলে = জনৈক ইংরেজ ইতিহাস-প্রণেতা।

৭১ গুরুপাক য়্যাবষ্ট্রাকট্ = দুর্ব্বোধ্য ভাব (শ্লেষোক্তি)।

বারিক = সেনানিবাস।

৮৮ Exploitation = শোষণ।

Materialistic = বস্তুজাগতিক।

৯০ স্যাঙ্কটিটি অফ লাইফ = জীবনের পবিত্রতা।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	হিষ্টিপড়া, ইংরাজি বক্তৃতার	হিষ্টিপড়া ইংরাজি বক্তৃতার
	মরুক আর বাঁচুক সে—সমস্ত	মরুক আর বাঁচুক, সে সমস্ত
	নির্ম্মল	নির্মূল
২৭	অবলম্বন করিতে হইবে।	অবলম্বন করিতে হইবে,
৪০	করতে বাধ্য হয়েচি	করতে বাধ্য হয়ে আছি
৪৯	ফুলের রাজা	ফুলার রাজা
৬৫	সাহিত্য ইতিহাসের	সাহিত্য ও ইতিহাসের
৫৮	অর্থ, স্বাস্থ্য ও চরিত্র	অর্থে, স্বাস্থ্যে ও চরিত্রে
৬৯	যা পড়ে তা পরীক্ষা পাশের	যা' পড়ে, পরীক্ষা পাসের
৬৯	তাতে যেন ঠেসে ঠুসে	তাতে যেন তা' ঠেসে ঠুসে
৭০	দিনে দিনে যে কোন্	দিনে দিনে যে কত
৭০	মানুবকে	মানুষকে
৭৪	শিল্পকে	শিক্ষাকে
৭৮	শিক্ষক কাগজে বিজ্ঞাপন	শিক্ষক, কাগজে বিজ্ঞাপন